বার্ধক্য ও সমাজমন

অসীম বর্ধন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

বার্ধক্য ও সমাজ-মন

অসীম বর্ধন
এম্. এড., এম্. এ, পি-এইচ. ডি.

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

BĀRDHAKYA O SAMĀJ MON

[Ageing & Social Psychology]

ASIM BARDHAN

প্রকাশকাল—জুলাই ১৯৮৭

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রাকর :
রূপলেখা
২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য : ছয় টাকা

Published by Dr. Ladli Mohan Roychowdhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

উৎসর্গ

আজীবন শিক্ষাব্রতী ৺ পিতৃদেব

অনিলকুমার বর্ধনের স্মৃতির উদ্দেশে—

তাঁরই বার্ধক্য-পরিণতি থেকে
বার্ধক্য-সমাজ-মনোবিজ্ঞান নিয়ে
চর্চার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম
কুড়ি বছর আগে।

ভূমিকা

এযাবৎ শিশু-মনোবিজ্ঞান থেকে শুরু ক'রে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান, শিল্পশ্রমিক মনোবিজ্ঞান, সমাজ-মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা-পর্যায়ে মানুষের মন নিয়ে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা, গ্রন্থ রচনা, এমন কি বিশেষ পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার উদ্যোগেও এদেশে-বিদেশে অনেকে প্রয়াসী হয়েছেন। আমি নিজেও বিগত ৩৫ বছর যাবৎ মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রে অধ্যয়ন অধ্যাপনা চর্চা করেছি, নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছি। ষাটের দশকে প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিক্ষণে এসে ক্রমে আমি বার্ধক্য মনোবিজ্ঞানের চর্চায় বিশেষ আগ্রহ বোধ করতে থাকি।

আমার অশীতিপর অথর্ব অক্ষম পিতৃদেব তখন দীর্ঘকাল শয্যাগ্রস্ত। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বার্ধক্য ও সমাজ-মনের একটা দিক নিয়ে চর্চার প্রবণতা জেগেছিল আমার মধ্যে। 'দেশ' পত্রিকায় ঐ বিষয়ে আমার লেখা প্রথম নিবন্ধ 'বৃদ্ধদের বিষাদ মনোবিকার' প্রকাশিত হলে বুঝেছিলাম — পাঠকমহল ঐ বিষয়ে আরও চিন্তার খোরাক খুঁজে ফিরছে। এরপর 'অমৃত', 'যুগান্তর', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'দৈনিক বসুমতী' এবং পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত 'বিজ্ঞানজগৎ' পত্রিকাতেও বার্ধক্য মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে ছোট ছোট নিবন্ধ লিখেছিলাম পাঠকমহলে বৃদ্ধসমাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সচেতনতা জাগিয়ে তোলারই উদ্দেশ্যে।

বর্তমান গ্রন্থখানি সেই উদ্দেশ্য-আগ্রহেরই ফলশ্রুতি। পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ থেকে বিজ্ঞান-গ্রন্থমালা প্রকাশনার প্রকল্প যখন প্রবর্তিত হল, তখন ঐ গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ তারকমোহন দাশ মহাশয়ের পরামর্শে এবং পুস্তক পর্ষদ-এর তদানীন্তন মুখ্য আধিকারিক অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা মহাশয়ের আহ্বানে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে মনোনিবেশ করি। প্রধানত তাঁদেরই প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থে আমার চিন্তাভাবনা ও চর্চার ফসল তুলে দিতে পেরেছি। পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে সহায়তা করেন শ্রীমতী কণিকা বর্ধন।

তার পরে নানাভাবে পরামর্শ দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞান বিভাগের রীডার ডঃ রবীন্দ্রনাথ সেন। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় যদিও মূলত সমাজ-

মনোবিজ্ঞান, তাহলেও ডঃ সেনের সুচিন্তিত পরামর্শ ও সহযোগিতায় বার্ধক্যের গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তিক বিবেচনাগুলিও সন্নিবিষ্ট করার সুযোগ পেয়েছি।

প্রাচীন সভ্যতার সময় থেকেই সব দেশে সব যুগে সব সমাজেই বয়োবৃদ্ধ মানুষদের সমীহ শ্রদ্ধা করে চলার রীতি প্রচলিত। তার জন্য বই পড়ে কাউকে সচেতন হতে হয়নি। বৃদ্ধ মানুষকে রক্ষা করার মানসিকতা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জেগেছিল।

আজ শিক্ষাদীক্ষায় বিজ্ঞানচিন্তায় সমাজ সভ্যতা কত না উন্নতশির, কত না গর্বিত! এমনই দিনে শতসহস্র বিষণ্ণ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ম্লান মুখ স্মরণ ক'রে, তাঁদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হবার মানসিকতা পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসে সমাজ-মনের কাছে আবেদন জানিয়ে নিবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করতে হচ্ছে ভেবে কষ্টই হয়। সে-কষ্ট সার্থক হবে যদি গ্রামে গঞ্জে ঘরে ঘরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনে এতটুকুও প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পায়—পাঠকবর্গের সহৃদয় প্রচেষ্টায়।

গ্রন্থখানি দ্রুত প্রকাশনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদের বর্তমান মুখ্য আধিকারিক ডঃ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী এবং তাঁর সহকর্মীগণ বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

১ জুলাই ১৯৮৭ **অসীম বর্ধন**

সূচীপত্র

অধ্যায় ১ ॥ পরিচায়িকা ১

অধ্যায় ২ ॥ ইতিহাস ৯

অধ্যায় ৩ ॥ বিভিন্ন মতবাদ ১৪

অধ্যায় ৪ ॥ জৈবিক ও শারীরবৃত্তিক চিন্তা ১৮

অধ্যায় ৫ ॥ সাধারণ স্বাস্থ্য ২৪

অধ্যায় ৬ ॥ যৌনতা ৩২

অধ্যায় ৭ ॥ মৃত্যুচিন্তা ৩৭

অধ্যায় ৮ ॥ মনোবিজ্ঞান ৪১

অধ্যায় ৯ ॥ পরিবেশ ৫২

অধ্যায় ১০ ॥ অবসর ৫৯

অধ্যায় ১১ ॥ পরিবার ও বন্ধুবান্ধব ৬১

অধ্যায় ১২ ॥ রাজনীতি ৬৪

অধ্যায় ১৩ ॥ ধর্মচিন্তা ৬৮

অধ্যায় ১৪ ॥ উপসংহার ৭১

॥ অধ্যায় ১ ॥
পরিচায়িকা

মানবজীবনের বিকাশ নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা যা হয়েছে, তা অধিকাংশই বিচ্ছিন্ন এবং অসম্পূর্ণ। এ নিয়ে যত গবেষণা-নিরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে দেখা গেছে, মানবজীবনের বিকাশের কোনও একটি পর্যায় নিয়েই হয়তো খুব বেশি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, অথচ সেই তুলনায় অন্য পর্যায়গুলি গবেষণা-নিরীক্ষার প্রভাব থেকে অবহেলিত রয়ে গেছে। মানবীয় বিকাশের যে পর্যায়টি এইভাবে বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি, সেটি হলো বার্ধক্য।

বার্ধক্য যে কেবলমাত্র মানুষের সময়ভিত্তিক বয়স (chronological age) অনুসরণ করেই আসে, তা নয়। অনেক মানুষের সময়ভিত্তিক বয়স সমান হলেও নানা কারণে তাদের মধ্যে শারীরভিত্তিক বয়স (physiological age)-এর তারতম্য সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। সমবয়সী বৃদ্ধদের মধ্যে কর্মক্ষমতা এবং অন্যান্য বিষয়ের এই যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, সে বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক নিরীক্ষা-গবেষণা আজও আমাদের দেশে যথাযথভাবে হয়নি। এরই ফলে সরকারী নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমার আগেই অনেকে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, আবার অনেকে ঐ বয়ঃসীমা অতিক্রম করেও বহু বছর কর্মঠ হয়ে থাকেন।

বার্ধক্য সম্পর্কে এই সকল ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ জ্ঞান-সম্পদের এই অভাব এদেশের সমাজের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক, কারণ আজ ভারতের লোকসংখ্যার বিপুল অংশ বার্ধক্যের পর্যায়ে জীবন অতিবাহিত করে থাকেন এবং পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে এ যুগে বৃদ্ধসমাজের লোকসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমসাময়িক ভারতীয় সমাজে বৃদ্ধদের ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনবিকাশের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়রূপে বার্ধক্য সম্পর্কেও তাই আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

সৌভাগ্যের কথা, বিগত কয়েক বছর হল, নানা দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে বার্ধক্য

এবং বৃদ্ধ সমাজ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, মনোবিজ্ঞানীরা আজ শিশু-মন ও কিশোর-মন সম্পর্কে যত নতুন গবেষণা করছেন, তার চেয়ে বেশি করে বৃদ্ধদের মন নিয়ে গবেষণার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। সমাজকর্মীরাও বৃদ্ধদের সামাজিক সমস্যাগুলির কারণ অনুসন্ধান ও তার প্রতিকারের দিকে মনোযোগী হচ্ছেন। শারীর-বিজ্ঞানীরা বৃদ্ধদের শারীরবৃত্তিক বিকাশ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশেষ ধরনের নিরীক্ষা-গবেষণার দিকে আত্মনিয়োগ করছেন এবং তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাও চাইছেন, চিকিৎসা শাস্ত্রে বৃদ্ধদের চিকিৎসা সমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা পর্যালোচনা করতে। শিক্ষাবিজ্ঞানীরা বলছেন, যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থোপার্জনের তাগিদে উচ্চ শিক্ষায় অনেক ক্ষেত্রে ছেদ পড়ার জন্য বৃদ্ধ বয়সে গ্রহণযোগ্য কিছু বিশেষ শিক্ষাসূচী প্রচলন করা উচিত।

স্থপতিবিদ্‌রাও লক্ষ্য করেছেন, আধুনিক নকশায় ঝক্‌ঝকে চকচকে যেসব বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সের মানসিক তৃপ্তির পক্ষে তা সবসময়ে অনুকূল হয় না। যৌন-বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ৬০ বছর বয়সেও যৌনসচেতনতা থাকে। সরকারী প্রশাসনবিদরা ক্রমশই উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে, বৃদ্ধ জনগণ দেশের রাজনৈতিক জীবনধারায় একটা বিপুল শক্তিক্ষেত্র সৃষ্টি করে থাকেন এবং সেজন্য পৃথিবীর সব উন্নত দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় বৃদ্ধদের অসন্তোষ সৃষ্টির মত কোন কিছু যাতে না করা হয়, সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, যেসব কর্মক্ষেত্রে, সংগঠনে এ যাবৎ বৃদ্ধদের ভূমিকা প্রায় অবহেলিত হয়ে আসছিল, ইদানীং ক্রমশই সে সব ক্ষেত্রে বৃদ্ধদের প্রতি সযত্ন মনোযোগ প্রসারিত হতে দেখা যাচ্ছে।

এ যাবৎ বার্ধক্য এবং বৃদ্ধদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল কেবলই কতকগুলি ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার আর বয়োবৃদ্ধিজনিত আশঙ্কায় আবৃত। এগুলি মারাত্মকভাবে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। যেমন, মহিলাদের মনে করা হ'ত পুরুষদের চেয়ে নানাভাবে নিকৃষ্ট এবং ঐ ধারণার ফলে সমাজে মহিলারা যে আচরণ পেতেন, তা থেকে হীনমন্যতার ধারণাই বদ্ধমূল হ'ত।

পেশাগত কর্মক্ষেত্রেও মহিলাদের ভূমিকা স্বীকৃত হ'ত না বলে সাধারণভাবে সমাজের সকলে এবং বিশেষভাবে মহিলারা নিজেরাই নিজেদের মর্যাদাবোধ গড়ে তুলতে পারেননি। এই ব্যক্তিত্ব-বিপর্যয় শোচনীয় পর্যায়ে পৌছত মহিলাদের বৃদ্ধ বয়সে। শিক্ষা অর্জনেও মহিলাদের আগ্রহ ও সুযোগ হ'ত কম, সমাজে মহিলারা এসব সুযোগ খুব সহজে পেতেন না। যেসব মহিলা এই বাধা অতিক্রম করতে চাইতেন, তাঁরা

বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সমাজের প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জর্জরিত হতেন।

আজও সমাজে এরকম ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে। অনেকে আজও মনে করেন বয়স হলে বুদ্ধিভ্রংশ বা ভীমরতি ঘটে। 'ভীমরতি' কথাটির আভিধানিক অর্থ হ'ল বার্ধক্যজনিত বুদ্ধিভ্রংশ। এই কথাটির সংস্কৃত মূল শব্দ 'ভীমরথী'—যার মানে হ'ল প্রাচীন অবস্থা বিশেষ, যে অবস্থা ঘটে ৭৭ বছর ৭ মাস বয়সের ৭মী রাত্রে। এই অবস্থা বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কারুর কোন ধারণা আছে বলে জানা নেই। তবে ৬০ বছর বয়সের বৃদ্ধ ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রংশ হয় বলে বর্তমান যুগে কেউ সুদৃঢ় অভিমত পোষণ করেন বলে মনে হয় না। সুতরাং বলা যায় যে, বৃদ্ধ বয়সে 'ভীমরতি' কথাটির সঠিক তাৎপর্য এবং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ না জেনেই সমাজে তা অবাধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যা বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পক্ষে অবমাননাকর এবং ক্ষতিকরও বটে।

ঠাকুরদার বয়সী কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি ৪০ বছর পূর্বেকার কোন ঘটনা স্মরণ করতে না পারেন, তাহলেই অনেকে সিদ্ধান্ত করে ফেলেন যে, বৃদ্ধ বয়সের বুদ্ধিভ্রংশ তাঁর এসে গেছে। সমাজে তখন ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তিটি ক্রমশ অপাংক্তেয় হতে শুরু করেন। বিস্মৃতি আর বুদ্ধিভ্রংশ এইভাবে সাধারণ মানুষের কাছে সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, কোন কিছু স্মরণে আনতে না পারলেই প্রায়বৃদ্ধ মানুষের মনে অমূলক আতঙ্ক সৃষ্টি হতে থাকে—বুঝি তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ শুরু হচ্ছে। সহজেই অনুমেয়, এই ধরনের চিন্তাভাবনা বৃদ্ধ সমাজের পক্ষে কতখানি সর্বনাশা।

এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণার ফলেই অনেকে বৃদ্ধ মানুষের কথায় কর্ণপাত করারও আগ্রহ বোধ করেন না। কোন বৃদ্ধ মানুষ যখন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরি করেন, তখন অধিকাংশ লোকই বুঝতে চান না যে স্বাভাবিক শ্রবণশক্তির দুর্বলতার জন্য ও স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার বিলম্বের ফলে সময় বেশি লাগছে। বরং তাঁরা মনে করেন, বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে। ঠিক তেমনি, বৃদ্ধ বয়সে কোন ব্যক্তি নিজের জামার বোতামটি ঠিকমত লাগাতে না পারলে সকলে ভাবেন তাঁর স্নায়ু ও মন ঠিকমত কাজ করছে না; প্রকৃতপক্ষে, বৃদ্ধ মানুষটির দেহের সন্ধি, অস্থি ও পেশীতে হয়ত মৃদু আরথ্রাইটিস শুরু হওয়ার ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণ ঠিকভাবে করতে তিনি পারছেন না, এই মনে ক'রে সহানুভূতি সহকারে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।

যে কোনও বৃদ্ধ মানুষ যদি ক্রমাগত এই ধরনের মন্তব্য সমাজের ছোট বড় বিভিন্ন জনের কাছ থেকে শুনতে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর আত্মবিশ্বাস ব্যাহত হবে, অথবা তিনি উগ্র বিরক্তির অবাঞ্ছিত মানসিকতায় আক্রান্ত হবেন।

আশা করব, এই গ্রন্থখানি পাঠ করলে পাঠকসমাজ বার্ধক্য সংক্রান্ত নানাপ্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস, অজ্ঞতা এবং আতঙ্কের প্রভাবমুক্ত হতে প্রয়াসী হতে পারবেন।

বার্ধক্যবিজ্ঞানের কয়েকটি পরিভাষা

বার্ধক্যবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করার জন্য কতকগুলি শব্দ ও পরিভাষার সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলি জেনে রাখলে এবিষয়ে আলোচনা অনুধাবন করা সহজতর হবে।

বার্ধক্য বিজ্ঞানের ইংরেজি **গেরোনটোলজি** (Gerontology) শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'গেরাস' (*geras*) থেকে, যার মানে হ'ল বার্ধক্য, এবং 'লোগোস' (*logos*) শব্দটির দ্বারা বোঝায় কোন কিছুর চর্চা বা বর্ণনা। গ্রীক শব্দ গেরোন (*geron*) মানে বৃদ্ধ ব্যক্তি, 'অনটোস' (*ontos*) মানে বিকাশ। বৃদ্ধ ব্যক্তির বিকাশচর্চার যে শাস্ত্র, তার নাম তাই গেরোনটোলজি (বার্ধক্যবিজ্ঞান)। অতএব গেরোনটোলজি বা বার্ধক্যবিজ্ঞান হ'ল বৃদ্ধ বয়সের বিকাশ সম্পর্কিত চর্চা। এই চর্চার মধ্যে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং শারীরবিজ্ঞানের অনেক কথাও আসে।

বার্ধক্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরও একটি শব্দের ব্যবহার হচ্ছে, সেটি হ'ল **সামাজিক বার্ধক্যবিজ্ঞান** (সোশ্যাল গেরোনটোলজি)। বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং তাঁর সামগ্রিক সমাজের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, তারই বিশ্লেষণ বিচার করে থাকে সামাজিক বার্ধক্যবিজ্ঞান। বার্ধক্যবিজ্ঞানের একটি শাখা-শাস্ত্ররূপে এর ক্রমশই বিকাশ ঘটছে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে যাঁরা বার্ধক্যবিজ্ঞানের তথ্যজ্ঞান প্রয়োগ করে থাকেন, তাঁরা **বৃদ্ধচর্যা** (গেরিয়াট্রিক্স্, geriatrics) শব্দটির ব্যবহার করে থাকেন। এটিও সামাজিক বার্ধক্যবিজ্ঞানের মত মূল বার্ধক্যবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা-শাস্ত্ররূপে ক্রমশই মর্যাদা লাভ করছে। বৃদ্ধ বয়সে রোগ চিকিৎসার কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতিপ্রক্রিয়া আছে এবং বার্ধক্যজনিত রোগব্যাধির উৎপত্তি ও প্রশমন বিষয়ে বিশেষ পর্যবেক্ষণেরও উপযোগিতা আছে — সেকথা স্বীকৃত হয় এই বৃদ্ধচর্যা অর্থাৎ গেরিয়াট্রিক্স্ শাস্ত্রটির বিকাশের মাধ্যমে।

এদেশে শিক্ষাবিষয়ক চর্চাদি হয়ে থাকে প্রধানত শিশু কিশোর ও তরুণদের ভবিষ্যৎ চিন্তাকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর প্রসারের মাধ্যমে শিক্ষাবিদ্‌গণ ক্রমশই বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরও শিক্ষা অর্জনের সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হচ্ছেন। শিক্ষাবিজ্ঞানী এবং বার্ধক্যবিজ্ঞানীরা একযোগে পরিকল্পনা করে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের বয়সোপযোগী অর্থবহ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক ও তৃপ্তিকর

শিক্ষাসূচীর উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সের শিক্ষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত এই শাখাটির নাম হয়েছে **শিক্ষাশ্রয়ী বার্ধক্যবিজ্ঞান** (এডুকেশন্যাল গেরোনটোলজি)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (পলিটিক্যাল সায়েন্স)-এর ক্ষেত্রেও **বার্ধক্যতন্ত্র** (গেরোনটোক্রেসী) কথাটি প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। যে সরকার বৃদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রশাসিত হয়ে থাকে, সে সম্পর্কেই এই কথাটি প্রয়োগ করা হয়। গ্রীক শব্দ 'গেরাস' (*geras*) অর্থাৎ বার্ধক্য এবং 'ক্রাসিয়া' (*kratia*) অর্থাৎ শক্তি — এই দুটির সমন্বয়ে গেরোনটোক্রেসী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

বার্ধক্যবাদ (এজ্-ইজ্ম, ageism) শব্দটির প্রয়োগ আজকাল বুদ্ধিজীবীমহলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মানুষের বয়স অনুসারে সমাজে যেসব বিধিবৈষম্যের প্রচলন আছে, তার বিরুদ্ধে বিশেষ মতবাদ সৃষ্টি করতে চাইছে এই বার্ধক্যবাদ। কেবলমাত্র বয়সের পার্থক্য থাকার জন্যই মানুষ অন্য মানুষের হীনতা বা শ্রেষ্ঠতার যে ধারণা করে থাকে, সেই সংস্কারের বিরোধিতা করে বার্ধক্যবাদের ভাবধারা। কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষার সুযোগসুবিধা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বয়স অনুসারে বিশেষ সুযোগসুবিধার নীতি অবলম্বন করেই বার্ধক্যবাদ গড়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি, সেটি হ'ল **বার্ধক্য-আতঙ্ক** (গেরোনটোফোবিয়া, gerontophobia)। গ্রীক ভাষায় 'ফোবোস' (*phobos*) মানে আতঙ্ক। বার্ধক্য এগিয়ে আসতে থাকলে এবং বৃদ্ধ মানুষের প্রতি সমাজের যে ঘৃণা-অবহেলা আছে, তার কথা ভেবে মানুষের মনে যে আতঙ্ক জাগে, তারই নাম বার্ধক্য-আতঙ্ক।

বার্ধক্যবিজ্ঞান শাস্ত্রে বয়োবৃদ্ধি (এজিং, aging) বলতে বোঝায় বয়স বৃদ্ধির শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। বিজ্ঞানসম্মতভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেক জীবদেহ ভ্রূণসৃষ্টির সময় থেকেই বয়োবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার অধীন হয়ে থাকে। বর্তমান গ্রন্থে বয়োবৃদ্ধির সামাজিক তাৎপর্যই বেশি পরিমাণে আলোচিত হবে।

সাধারণভাবে মানুষের জীবনে দ্রুত বয়োবৃদ্ধির লক্ষণগুলির প্রকাশ ঘটে ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত। ঐ বয়সের পরে বয়োবৃদ্ধি লক্ষণগুলির পরিবর্তনের হার কমে যেতে দেখা যায়। সাধারণত বয়স বৃদ্ধি হতে থাকে খুবই ধীরগতিতে। সেজন্য দেহমনের উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন দেখা গেলে তবেই মানুষকে সমাজে বয়োবৃদ্ধির লক্ষণাক্রান্ত বলে অভিহিত করে থাকে। যেমন—টাক পড়া, চুল পাকা, কাছের জিনিস দেখার জন্য চশমা ধারণ ইত্যাদি পরিবর্তন এলেই মানুষ বৃদ্ধ হচ্ছে বলে সমাজে চিহ্নিত হয়ে যায়।

কিন্তু বৃদ্ধ (এজেড, aged) বলব কাকে, তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। যাঁর বয়স ৭৫ বছর, তিনি যেমন নিজেকে বৃদ্ধ বলে দাবী করতে পারেন, একজন ৬৫ বছরের মানুষও নিজেকে বৃদ্ধ বলতে দ্বিধা করেন না। কর্মক্ষেত্রে ৬০ বছর বয়সে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের বছর দুয়েক আগে থেকেই অনেকে নিজেকে বৃদ্ধপর্যায়ভুক্ত বলে বিঘোষিত করতে থাকেন। বার্ধক্যবিজ্ঞান ক্ষেত্রে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার সময়ভিত্তিক বয়স (chronological age) গুনে বার্ধক্য নির্ধারণ না করে শারীরবৃত্তিক কর্মপ্রক্রিয়ার লক্ষণ, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ অথবা অন্যান্য সামাজিক বৈশিষ্ট্যাদি বিশ্লেষণ করে শারীরবৃত্তিক বয়স (physiological age) বা বৃদ্ধত্ব নির্ধারণ করে থাকেন।

বর্তমান গ্রন্থে 'বৃদ্ধ' বলতে ৬৫ বছরের ওপরে যাঁদের বয়স, সেই সব বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদেরই বোঝানো হবে।

বৃদ্ধ ব্যক্তিদের গণচিত্র

দেশের জনসংখ্যার বিশ্লেষণে বিভিন্ন ব্যক্তিসমষ্টির যে তুলনামূলক চিত্র পরিস্ফুট হয়, তাকেই গণচিত্র (ডেমোগ্রাফী, Demography) বলা চলে। গণচিত্র পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে নারী-পুরুষ ভেদে বয়সভেদে ধর্মভেদে বৃদ্ধ সমাজগোষ্ঠীর মানুষদেরও তুলনামূলক পরিবর্তনশীল পরিসংখ্যান খুঁজে পাওয়া যায়। দেশের অর্থনীতি বা সামগ্রিক প্রগতি কেমন করে বৃদ্ধ সমাজগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে, গণচিত্রকর (ডেমো-গ্রাফার) তাও জানতে চান। এ থেকে সমাজের একটি চিত্তাকর্ষক চিত্ররূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

গণচিত্র পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, দেশের জনসংখ্যার কোন একটি বিশেষ অংশের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে সামগ্রিকভাবে সমাজে কতরকম পরিবর্তন আসতে পারে। যেমন, জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে বা বিপুল জনসংখ্যা বিস্ফোরণের পরিণামে সমাজে পরিবার-গোষ্ঠীর আকৃতি-প্রকৃতির যে পরিবর্তন ঘটে, তার দ্বারা সামাজিক চরিত্রও অনেক বদলে যায়। গণচিত্র-বিশেষজ্ঞরা এইভাবেই জনসংখ্যার বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিবর্তনশীল অনুপাত পর্যালোচনা করে সমাজের ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্পর্কে নানাপ্রকার আভাস দিতেও চেষ্টা করে থাকেন।

যেমন ধরা যাক্, কোনও কারণে কোনও লোকক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহের ফলে দেশের বহু যুবকের প্রাণহানি হলে, দেশের সামাজিক বিধিব্যবস্থায় যেসব পরিবর্তন আসতে পারে, সেগুলি হতে পারে এইরকম :—

১। কর্মক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

২। নারী, শিশু ও পরিবার গঠনের ধারণা বদলে যেতে পারে। দ্রুত সন্তান সৃষ্টির জন্য নারীদের, এমনকি অবিবাহিতাদেরও হয়ত উৎসাহ দেওয়া হতে পারে—যাতে যুদ্ধে বিনষ্ট জনসংখ্যা যথাসম্ভব শীঘ্র পরিপূরিত হতে পারে। নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে, কর্মরতা মায়েদের শিশু প্রতিপালনের জন্য শিশুপালন কেন্দ্র গড়ে উঠবে, যেখানে বিকল্প মায়েরা শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এইভাবে 'ভাল' পরিবারগোষ্ঠী সম্পর্কে সামাজিক ধারণা বদলে যেতে পারে।

৩। সমাজে যুবতীদের সংখ্যানুপাত বেশি হওয়ার জন্য অল্পবয়সী মেয়েদের বিবাহযোগ্যা বলে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হতে থাকবে এবং বহুবিবাহ প্রথাও গ্রহণ-যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

এই দৃষ্টান্তটি এখানে আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, নানা কারণে গণচিত্রের বৈশিষ্ট্য আত্যন্তিকভাবে কোনও একটিমাত্র ক্ষেত্রেও রূপবদল করলে তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দ্রুত সঞ্চারিত হয়ে পড়তে পারে সমাজের অন্যান্য বিভিন্ন পর্যায়ে — শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত। তার ফলে, সামাজিক রূপরেখার ওপর সেই গতিঝুতা সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন সূচিত করতে পারে।

এদেশের বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সমাজগোষ্ঠীর গণচিত্র নিয়ে তাই কিছু পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

ভারতে বৃদ্ধ জনসংখ্যার বৃদ্ধি

ভারতীয় সমাজে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত কয়েক দশকে এই বৃদ্ধি দ্রুততর হয়েছে। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধদের বার্ধক্যের বয়ঃসীমাও বাড়তে দেখা যাচ্ছে। এর কারণ, সাধারণভাবে মানুষের আয়ু কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে সম্ভবত চিকিৎসা বিজ্ঞানেরই কল্যাণে। এছাড়া, জন্মহারও সেই অনুপাতে কমে গেছে বলে একথা মনে করা যায় যে, সমাজে এর সঙ্গে বৃদ্ধদের প্রতি মনোভাবের পরিবর্তনেরও একটা অনুবন্ধ (কোরিলেশ্যন, correlation) আছে।

যেমন, ১৯৮২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার '২০০০ সালে সকলের স্বাস্থ্য' বুলেটিনে বলা হয়েছে — সত্তরের দশকে পৃথিবীতে ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক মানুষ ছিল ৩০ কোটি ৭০ লক্ষ ; এই শতকের শেষে সেই সংখ্যা ৫৮ কোটিতে দাঁড়াবে। এশিয়াতে ৬০-বছরের বেশি-বয়স্ক মানুষের সংখ্যা হবে ২৮ কোটি। উন্নয়নশীল দেশ-গুলিতে পুরুষদের থেকে সাধারণত মেয়েদের আয়ু গড়ে ২ থেকে ৪ বছর এবং উন্নত

দেশগুলিতে ৮ থেকে ১০ বছর বেশি হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বয়স্ক সমস্যার বিশ্ব সম্মেলনে পরিবেশিত তথ্যাদি থেকে জানা যায়, ৭৫-বছরের বেশি বয়স্ক মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি। আমেরিকার 'ওল্ডার উইমেন্স্ লীগ' যে-তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা থেকেও জানা গেছে, ৬৫-বছরের বেশি বয়স্ক জনসংখ্যার ৫৯ শতাংশই মহিলা এবং ৭৫-বছরের বেশি-বয়স্ক জনসংখ্যায় একজন পুরুষ তো দুজন মহিলা।

বৃদ্ধদের চেয়ে বৃদ্ধাদের সংখ্যা কিন্তু বেশিই দেখা যায়। তার কারণ, বৃদ্ধদের আয়ু সচরাচর কমই হয়। তাছাড়া জন্মকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়, পুরুষ-সন্তানের মৃত্যুহার বেশি। শৈশব এবং কৈশোরেও পুরুষ-সন্তানের মৃত্যুহার বেশি। এর ফলে পুরুষ ও নারী জনসংখ্যার অনুপাতে সর্বদাই এখন নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আছেন। সুতরাং সমাজে অবিবাহিতা অথবা বিধবা বৃদ্ধার সংখ্যা বৃদ্ধ পুরুষদের চেয়ে বেশি হওয়ার ফলে বৃদ্ধাদের নিঃসঙ্গতার সমস্যাটাই অধিকতর প্রকট।

বৃদ্ধ বয়সে উপার্জনের ক্ষমতা অনুপাতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৬৫-বছরের বেশি-বয়স্ক বৃদ্ধদের মধ্যে কমপক্ষে ১০ থেকে ২০ শতাংশ জন থাকেন উপার্জনহীন। এর অর্থ বৃদ্ধদের এই উপার্জনহীনতা হ'ল নির্ভরশীলতারই নামান্তর। যে-সমাজে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করতে উপার্জনশীল মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, সেই সমাজে এই ধরনের নির্ভরশীল বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মর্যাদাহানি সহজেই অনুমান করা যায়।

আরও একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, দেশের বৃদ্ধ জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি জন বাস করেন শহরাঞ্চলে। আবার শহরবাসী ঐ বিপুল বৃদ্ধ জনসংখ্যারও অধিকাংশের বাস শহরের জনবহুল অঞ্চলগুলিতেই। শহরের বাইরে বৃদ্ধ বাসিন্দারা মুক্ত বাতাসে স্বচ্ছন্দ অবসরে সুস্থতর জীবন যাপন করেন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা শহরের বৃদ্ধদের চেয়ে চিকিৎসার অনেক কম সুবিধা, যানবাহনের কম স্বাচ্ছন্দ্য এবং সামাজিক মেলামেশার কম সুযোগ পেয়ে থাকেন। ফলে, তাঁদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়।

অধিকাংশ বৃদ্ধই এদেশে কোন না কোনও পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করে থাকেন। এই পরিবারগোষ্ঠীর গঠন হতে পারে কেবলমাত্র স্বামী ও স্ত্রীকে নিয়ে এবং এরকম পরিবারগোষ্ঠীর সংখ্যাই খুব বেশি। তবে বিরাট অবিভক্ত পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যেও অল্পসংখ্যক বৃদ্ধবৃদ্ধার বসবাস আছে। উল্লেখযোগ্য এই যে, একাকী বসবাস করেন যত বৃদ্ধ, তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় একাকী বসবাস করেন বৃদ্ধারা।

॥ অধ্যায় ২ ॥

ইতিহাস

বার্ধক্য নিয়ে প্রাচীনকালে সমাজচিন্তার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হত বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে সমাজ-সচেতনতা জেগেছে খুবই সম্প্রতি।

এর কারণ এই যে, সে যুগে বৃদ্ধদের আয়ু ছিল অপেক্ষাকৃত স্বল্প। লক্ষ বছর আগে প্রাক্-প্রস্তর যুগে মানুষের আয়ু হত ২০ বছরেরও নিচে। এ যাবৎ, প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মাধ্যমে ঐ যুগের মানুষের কঙ্কাল যা ভূগর্ভ থেকে পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে ৫০-বছরের বেশি-বয়স্ক মানুষের কঙ্কাল একটিও পাওয়া যায়নি। ৮০০০ থেকে ৩৫,০০০ বছর আগে প্রস্তর যুগেও মানুষের গড়পড়তা আয়ু ছিল ২০ বছর। এ যাবৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের যতগুলি নরকঙ্কাল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করেছেন, সেগুলির মধ্যে মাত্র ১ শতাংশ কঙ্কালের মানুষের মৃত্যু হয়েছিল ৫০ বছর বয়সে। ঐ যুগের ৬৫ বছর বয়সের বৃদ্ধ কোনও মানুষের কঙ্কালের অবশিষ্টাংশ আজও পাওয়া যায়নি।

কোন কোন ক্ষেত্রে আয়ু সে যুগে ছিল মাত্র ১৮ বছর। রোম সভ্যতা এবং আর্য সভ্যতার যুগে আয়ুর উর্ধ্বসীমা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবুও যতদূর জানা যায়, প্রাচীন গ্রীস দেশে সাধারণ মানুষের মৃত্যু হত ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে ; রোমে ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে। বৃটেনে মধ্যযুগে মানুষ বাঁচত গড়ে ৩৩ বছর, আর আমেরিকায় গড়ে ৪৮ বছর। ভারতবর্ষে কিছু বেশি।

ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে 'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ' বিধি লক্ষ্য করে বোঝা যায়, ভারতবর্ষে ৫০ বছর বয়সে সম্ভবত বার্ধক্য নির্ধারিত হত। ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈদিক সভ্যতায় চতুরাশ্রম প্রথা অনুযায়ী বার্ধক্যের প্রারম্ভে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করে গৃহস্থকে বনে-উপবনে নিরিবিলিতে বাস করার বিধান দেওয়া হয়েছিল। এমনকি বানপ্রস্থ আশ্রম পর্যায়ের পরে জড়জগতের সকল বিষয়ে বৈরাগ্য চর্চার মাধ্যমে শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস আশ্রমের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং অনুমান করা যায়, বৈদিক সমাজে বৃদ্ধদের মনোবিকাশের সামঞ্জস্য বিধান করে বিশেষ সহানুভূতি সহকারে শান্তিলাভের পথনির্দেশ করা হয়েছিল।

প্রাচীনকালে রোগব্যাধি, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং প্রতিকূল কর্মজীবনের জন্য বৃদ্ধ হবার আগেই বহু লোকের মৃত্যু ঘটত। দুর্বল হয়ে থেকে বৃদ্ধরা সমাজে বসবাসের সুযোগ থেকে হতেন বঞ্চিত। অশীতিপর বৃদ্ধের সংখ্যা ছিল নগণ্য। থাকলেও, তাঁরা একান্ত অথর্ব হয়েই থাকতেন।

আজ সেইদিন বদলে গেছে। তখনকার দিনে প্রৌঢ়ত্বের পূর্বেই বীরত্ব সহকারে মৃত্যু বরণের মর্যাদা ছিল সমাজে। দুর্বল ব্যক্তিরা বেঁচে থাকতেই পারত না। সুতরাং বার্ধক্যের বিকাশ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন বা সুযোগ কোনটাই হত না। মৃত্যু হত স্বাভাবিকভাবে এবং জীবনের মধ্যভাগেই প্রায় মানুষ দেহরক্ষা করত। এর ফলে, বৃদ্ধদের নিয়ে সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত ধারাবাহিক সমীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবর্তন হয়নি।

এ যুগে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বৃদ্ধ মানুষের সংখ্যানুপাত ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেজন্য বৃদ্ধ ও বার্ধক্য সম্পর্কে সমাজে নানাপ্রকার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জীবনের পর্যায়ক্রম সম্পর্কেও সামাজিক ধারণা ধীরে ধীরে বদলে গেছে। জীবনের পর্যায়ক্রম বলতে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্যের ক্রমান্বয়ী পর্যায় বিভাগগুলি বোঝায়। প্রাচীনকালে যে সব সমাজে সাধারণত ৫০ বছরের মধ্যেই মানুষের আয়ু শেষ হত, সেই সমাজে নিশ্চয়ই বার্ধক্য বলতে ৪০ বছর বয়সের পর্যায়টিকেই বোঝানো হত। প্রাচীনকালে যৌবনের পর্যায় ছিল মোটামুটি ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত। আজ মানুষের আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে এই পর্যায়-ক্রম পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং ১৫ বছর বয়সে কৈশোর পর্যায়ের ধারণা প্রচলিত হয়েছে। যৌবন পর্যায়টি প্রায় ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে।

এ সবই সামাজিক ধারণার ক্রমবিবর্তন এবং স্বভাবতই, এই গতিষ্ণু বিবর্তন সম্পর্কে দেশকালভেদে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। তবে মূল কথা যেটি, সেটি অনস্বীকার্য যে, মানুষের জীবনের পর্যায়ক্রম সম্পর্কে সামাজিক ধারণা অবশ্যই বদলে যাচ্ছে। যৌবনের পর্যায়ের সীমারেখা যেমন কয়েক বছর প্রসারিত হয়েছে, বার্ধক্যের পর্যায় সীমারেখাও তেমনি বেশ কয়েক বছর এগিয়ে গেছে।

ধর্মেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে বার্ধক্যের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণের ব্যাপারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ধর্মের মাপকাঠিতে খুব উচ্চ মর্যাদা বৃদ্ধরা কোন দেশেই পাননি কখনো। ধর্মীয় নেতারা কুমারী-পূজার বিধান রচনা করেছেন, কিন্তু বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা-পূজার কোন ব্যবস্থাই উচ্চারণ করেননি কোথাও। একমাত্র সধবা বৃদ্ধারা মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্মে কিছু বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকেন। পুরোহিতরাও বৃদ্ধ হলে সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। তবে, সাধারণভাবে, বৃদ্ধ জনগণের জন্য কোথাও এমন কোনও বিশেষ

ধর্মীয় বিধান বা অনুশাসন নেই, যার মাধ্যমে বৃদ্ধ বয়সে কোনও বিশেষ সুখ-সুবিধা বা মর্যাদা সম্মান দেওয়া হয়েছে।

শিল্পবিপ্লবের প্রভাবেও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সামাজিক মর্যাদা অনেকভাবে বদলে গেছে। শিল্পসভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পরিবারের কর্মঠ তরুণদেরই কর্মসংস্থানের জন্য কল-কারখানা অফিস-কাছারিতে আকর্ষণ করা হয়েছে — যার ফলে, বহু পরিবারগোষ্ঠীর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় রেখে কর্মক্ষম পুরুষরা দেশান্তর গমনে অভ্যস্ত হয়েছে। পূর্বেকার পারিবারিক গোষ্ঠীরূপ তার ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বৃহৎ শিল্পভিত্তিক সভ্যতার আরও একটি অশুভ পরিণাম ঘটেছে। বিগত যুগের অভিজ্ঞ কলাকুশলীরা বৃদ্ধ বয়সে অকস্মাৎ লক্ষ্য করলেন, যান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে অল্প ব্যয়ে স্বল্প সময়ে কত বেশি উৎপাদন করতে পারছে তরুণ যন্ত্রচালক শিল্পশ্রমিকরা। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে বৃদ্ধদের যথেষ্ট মর্যাদাহানি ঘটেছিল এবং সমাজে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ কলাকুশলীদের প্রতি অবহেলার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল।

অবশ্য যান্ত্রিক শিল্পভিত্তিক সভ্যতার শুভ ফলও কিছু কিছু বৃদ্ধরা ভোগ করছেন। এ যুগে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ কর্মীদের জন্য অবসরকালীন ভাতা (পেনশন) ইত্যাদির বন্দোবস্ত হওয়ার ফলে বৃদ্ধ বয়সে কর্মীদের গ্রাসাচ্ছাদনের দুশ্চিন্তা অনেকাংশে কমেছে। আধুনিক কল-কারখানায় বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বিশেষ ধরনের কাজে স্বচ্ছন্দে নিয়োজিত থাকতেও পারেন।

সমাজে এই ধারণাই প্রচলিত যে, বৃদ্ধদের চিন্তাধারা সর্বদাই তরুণদের চিন্তাধারা থেকে পৃথক। প্রগতির নামে সেজন্য বৃদ্ধদের অভিজ্ঞ চিন্তাধারাকে প্রাচীনতার চিহ্ন দিয়ে অপাঙক্তেয় করে রাখার প্রবণতা দেখা যায়। বৃদ্ধ বয়সে প্রত্যেক মানুষের মনেই এই বৈষম্যমূলক সামাজিক আচরণের দরুন বিরূপতার সৃষ্টি হয়। ফলে, বৃদ্ধ মানুষমাত্রই অল্পবিস্তর বিষাদ মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

বৃদ্ধদের এই ধরনের মনোবিকার এবং মানসিক প্রবণতার কথা চিন্তা করে সমাজ-বিজ্ঞানীরা বৃদ্ধদের মনের ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের জন্য আগ্রহ বোধ করছেন। তারই ফলে, বৃদ্ধদের নিয়ে গবেষণা-পর্যালোচনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে চলেছে।

বৃদ্ধদের অবহেলিত হবার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ, তাঁদের আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার অভাব। সেই অভাব দূর করার জন্য এ যুগে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা হয়েছে ব্যাপকভাবে।

মনোবিজ্ঞান জগতে বৃদ্ধদের মন নিয়ে বিশেষ ভাবনাচিন্তা পূর্বে ছিল না। কিন্তু ইদানীং বৃদ্ধদের নানাপ্রকার মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরাও বিশেষ নিরীক্ষার উপযোগিতা উপলব্ধি করছেন। আগে মনে করা হত, বৃদ্ধ বয়সে মনঃসমীক্ষা (সাইকো-

অ্যানালিসিস) প্রক্রিয়া কার্যকর করা যায় না। মনঃসমীক্ষার পথিকৃৎ সিগম্যণ্ড ফ্রয়েড নিজেই ঐ ধারণার বশবর্তী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্রমশই মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে, বৃদ্ধ মনোরোগীদেরও মনঃসমীক্ষার সাহায্যে সুস্থ মনের অধিকারী করে তোলা যায়।

সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুসরণ করে বলা হত, প্রাণিজগতে যোগ্য এবং সক্ষম যারা, তারাই প্রাণধারণের অধিকারী ; সুতরাং অক্ষম বৃদ্ধদের সম্বন্ধে সে-যুগের সমাজবিজ্ঞানীদের মনোভাব ছিল স্বভাবতই নেতিবাচক। এই মনোভাব ক্রমশই পরিবর্তিত হয়েছে এবং সমাজের সমস্যামূলক সকল বিষয়ের প্রতি সমাজ-বিজ্ঞানের মনোযোগ প্রসারিত হচ্ছে। সামাজিক পরিবেশ এবং বার্ধক্যের পারস্পরিক অনুবন্ধ নিয়ে আজকের সমাজবিজ্ঞানীরা ক্রমবর্ধমান আগ্রহ নিয়ে গবেষণা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে বার্ধক্যবিজ্ঞান বিষয়ে অধিকাংশ আলোচনা-পর্যালোচনাই সমাজ-বিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে চলে আসে।

চিকিৎসা ও ভেষজ বিজ্ঞান (মেডিক্যাল সায়েন্স) ক্ষেত্রে বার্ধক্যের রোগব্যাধি নিয়ে পুরাকাল থেকেই আগ্রহ দেখা যায়। বার্ধক্য দূর করে চিরযৌবন অক্ষুণ্ণ রাখার নানা প্রচেষ্টা হয়েছিল, তার ইতিবৃত্ত আমরা সাহিত্য ও শাস্ত্রে নানা স্থানে পেয়েছি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আজ স্বীকার করা হচ্ছে যে, জরা বা বার্ধক্যের জন্যই প্রাণীর মৃত্যু ঘটে না — তার শারীরবৃত্তীয় কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যাধিজনিত ব্যাঘাত সৃষ্টির ফলেই মৃত্যু ঘটে।

বিগত যুগে জনসংখ্যার অতি সামান্য অংশই বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করত। সেজন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের আগ্রহ বৃদ্ধদের প্রতি যতটা ছিল, এখন জনসংখ্যার অনুপাতে বৃদ্ধদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হতে থাকায় সেই আগ্রহ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন চিকিৎসা শাস্ত্রে বার্ধক্যবিজ্ঞানের বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (পলিটিক্যাল সায়েন্স)-এর ক্ষেত্রে বৃদ্ধদের প্রতি বিশেষ আগ্রহ থাকার কোন কারণই ছিল না বিগত যুগে। কিন্তু যখন জারমানিতে ১৮৮০ সালে সামাজিক নিরাপত্তা (সোশ্যাল সিকিউরিটি) ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন বিসমার্ক এবং বৃদ্ধ কর্মীদের অবসর-ভাতা (পেনশন) দেওয়ার নীতি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃত হল, তখন থেকেই বৃদ্ধরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা এবং অধিকারের মর্যাদা অর্জন করলেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সম্প্রতি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ভোটদানের আগ্রহ অন্য বয়সের ব্যক্তিদের চেয়ে বেশ কিছুটা বেশি। বৃদ্ধ ভোটদাতা-দের প্রভাবান্বিত করতে পারলে ভোটদানের সামগ্রিক ফলাফল বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে

থাকে। সেজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যায়ে বার্ধক্য সম্পর্কে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ক্রমশই সচেতন হয়ে উঠছেন।

এছাড়া বরাবরই দেখা গেছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে তরুণদের ওপর বৃদ্ধ নেতার প্রাধান্য এবং আধিপত্য সহজেই স্বীকৃত হয়ে এসেছে। বৃদ্ধ ভোটদাতাদের আগ্রহ এবং বৃদ্ধ রাজনৈতিক নেতা নির্ধারণের প্রচলিত প্রবণতা — এই দুই মানসিকতার মধ্যে একটি অনুকূল প্রত্যক্ষ অনুবন্ধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তরুণ কর্মীদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিকার ও সুযোগ দিয়ে এসেছেন বৃদ্ধ নেতারাই — এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এ নিয়ে নিরীক্ষার সূচনা হয়েছে।

নৃবিজ্ঞান (anthropology) নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা বৃদ্ধ ব্যক্তিদের কাছ থেকেই সংস্কৃতির ইতিহাস সংগ্রহ করে থাকেন। কিন্তু এ যাবৎ নৃবিজ্ঞানে বার্ধক্যের পর্যায় নিয়ে যথেষ্ট তথ্যাদি কোনও প্রজাতি সম্পর্কেই সংগৃহীত হয়নি। এর একটি কারণ হয়ত এই যে, নৃবিজ্ঞানীরা নিজেরা যে বয়সে উপনীত হন, বিভিন্ন মনুষ্য প্রজাতির সেই বয়সের তথ্যাদি সম্পর্কেই বেশি আগ্রহ বোধ করেন এবং তাঁরা এই কাজে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছেন — ফ্রয়েড মানুষের বার্ধক্য সম্পর্কে গুরুত্ব বোধ করেননি।

বার্ধক্য পর্যায়ের গুরুত্ব উপলব্ধির ইতিহাস স্বভাবতই খুব সংক্ষিপ্ত। এ যাবৎ নানা সমস্যামূলক বিষয়ে জাতীয় স্তরে বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন সভাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু বার্ধক্য সম্পর্কে এরকম কোনও গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন আজও এদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা নেই। তবে রাশিয়ায় ১৯৩৮ সালে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় বার্ধক্য সম্পর্কে জাতীয় সম্মেলন। এরপর ফ্রান্সে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি জাতীয় সমীক্ষা হয়। জার্মানিতেই প্রথম বৃদ্ধদের সম্পর্কে বিশেষ পত্রিকা প্রকাশ হয়। ১৯৩৯ সালে বৃটিশ বৈজ্ঞানিকরা একটি আন্তর্জাতিক বার্ধক্য গবেষণা ক্লাব (ইনটারন্যাশন্যাল ক্লাব ফর রিসার্চ অন এজিং) সংগঠন করেন। এ থেকেই পরে আমেরিকায় ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গেরোনটোলজিক্যাল সোসাইটি। শুধু তাই নয়, ওদেশে রাষ্ট্রীয় স্তরেও একটি 'ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অন এজিং' সংগঠিত হয়েছে।

অবশ্য বার্ধক্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সমাজ-মন এখনও যথাযথ প্রস্তুতি অর্জন করতে পারেনি। বার্ধক্য সম্পর্কে বিভিন্ন নীতিসূত্র এখনও সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। এবিষয়ে অবিরাম গবেষণা-পর্যালোচনা চালিয়ে যেতে হবে। সমাজে বৃদ্ধদের আনুপাতিক সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে এবিষয়ে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা সমাজ কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য, তা স্বীকার করতেই হবে।

॥ অধ্যায় ৩ ॥

বিভিন্ন মতবাদ

সমাজে বৃদ্ধদের নানাপ্রকার কর্তব্যকর্ম থেকে নিবৃত্ত করার যে মতবাদ প্রচলিত আছে, তা থেকে বার্ধক্যের প্রতি সমাজ-মনের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ মনে করে, বার্ধক্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে মানুষের দায়দায়িত্ব কর্মভার কমিয়ে দেওয়া দরকার। এই নিবৃত্তমূলক (**Disengagement**) মতবাদ বৃদ্ধ মানুষকে সমাজ থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

অবশ্য, বৃদ্ধ বয়সে নিবৃত্তমূলক সমাজ ব্যবস্থার সুফল উভয় পক্ষেই স্বীকৃত হয়ে আসছে। সমাজও এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেছে, বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। কোনও কর্মক্ষম লোক হঠাৎ দেহরক্ষা করলে সমাজের পক্ষে সেই শূন্যস্থান তৎক্ষণাৎ পূরণ করা সম্ভব হয় না, সেজন্যেই অগ্রগামী বৃদ্ধদের দায়দায়িত্ব ও বিবিধ কর্মভার থেকে নিবৃত্ত করে দিয়ে সেইস্থানে নবীন কর্মীদের প্রবৃত্ত করার রীতি সমাজ মেনে নিয়েছে। বৃদ্ধরাও দেখেছেন, এই ব্যবস্থার ফলে তাঁদের কর্মজীবনের দাবিদাওয়া, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং টানাপোড়েনের চাপ থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়। এর ফলেই বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের বয়স নির্ধারিত হয়েছে।

নিবৃত্তমূলক মতবাদের বিরোধিতা যে হয়নি, তা নয়। এর বিরুদ্ধ ভাবনা হ'ল প্রবৃত্তমূলক (**Activity**) মতবাদ। বার্ধক্যের প্রবৃত্তমূলক চিন্তাধারায় বিশ্বাস করা হয় যে, পরিণত বয়সের একটি বিশেষ পর্যায় মানুষের জীবনে 'স্বর্ণযুগ' সৃষ্টি করতে পারে। সেই সময়ে মানুষকে তৃপ্তিদায়ক কাজকর্মের দায়দায়িত্ব থেকে বাধ্যতামূলকভাবে নিবৃত্ত করলে বার্ধক্যের অতৃপ্তি এবং অস্বস্তি বৃদ্ধি পায়।

এজন্যেই বার্ধক্যের প্রবৃত্তমূলক মতবাদের সমর্থকরা বলে থাকেন, সকল বয়সেই মানুষ যত বেশি কাজ করার তৃপ্তি পাবে, ততই তার জীবনে সার্থকতা বোধ জাগবে এবং বার্ধক্য আর অবাঞ্ছিত মনে হবে না।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে বহু বৃদ্ধ মানুষের নানাপ্রকার দুর্বলতার জন্য তাঁদের

কর্মক্ষমতা অটুট থাকে না। ফলে, কাজের ত্রুটি হয় এবং ফলস্বরূপ, আত্মমর্যাদাবোধ আহত হয়। বিফলতার আশঙ্কায় তাঁরা অহরহ মানসিক অস্বস্তি ভোগ করেন। সুতরাং অনেকেই মনে করেন, বৃদ্ধ বয়সে যৌবনের মত কর্মজীবন যাপন করলে সাফল্যের সুখ অর্জন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

বার্ধক্যের নিবৃত্তমূলক ও প্রবৃত্তমূলক মতবাদ দুটির পরস্পর বিরোধিতার সামঞ্জস্য করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তিত্বমূলক (**Personality**) মতবাদ। কম কাজ করলে বৃদ্ধ বয়সে তৃপ্তি বোধ বেশি হয়, কিংবা বেশি কাজ করতে পারলে বৃদ্ধ মানুষ বেশি তৃপ্ত হন — এই দুটি মতবাদই অসম্পূর্ণ বলে ব্যক্তিত্ববাদীরা মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, কাজের পরিমাণটা তৃপ্তিবোধের মাপকাঠি হতে পারে না; প্রকৃতপক্ষে, বৃদ্ধ মানুষের বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিত্ব অনুসারেই কাজের পরিতৃপ্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে সব বৃদ্ধ মানুষের ব্যক্তিত্ব সংগঠনধর্মী, তাঁরা প্রৌঢ় বয়সের উপযোগী উচ্চ পর্যায়ের কাজ করেও পরম তৃপ্তিলাভ করে থাকেন। অন্যদিকে, যে সব বৃদ্ধ মানুষের ব্যক্তিত্ব নিবৃত্ত-ধর্মী, তাঁরা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে সংশয় বোধ করেন।

সমাজে সব বৃদ্ধ মানুষের সংস্কৃতি একরকম হয় না। অর্থ, প্রতিপত্তি, পেশাগত মর্যাদা প্রভৃতির নানারকম উপসংস্কৃতি (সাব-কালচার) অনুসারে বিভিন্ন বৃদ্ধ মানুষের কর্মোদ্যোগ সূচিত হতে পারে। এই উপসংস্কৃতি মতবাদ (**Sub-culture theory**) যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন, ধনী পরিবারের বৃদ্ধ মানুষের কাজ করবার আগ্রহ এবং দুঃস্থ পরিবারের বৃদ্ধ মানুষের কাজের আগ্রহের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য থাকবে। তেমনি শহরের বৃদ্ধ, গ্রামের বৃদ্ধ, আদিবাসী বৃদ্ধ, চাকুরীজীবী বৃদ্ধ, কৃষিজীবী বৃদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন বার্ধক্যের উপসংস্কৃতি অনুসারে বৃদ্ধদের কর্মপ্রবণতার মর্যাদা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

এছাড়া সমাজে মানুষের বিভিন্ন ভূমিকা অনুসারে অনেকে বৃদ্ধদের কর্মপ্রবণতার শ্রেণী বিভাগ করতে চেষ্টা করেছেন। এই ভূমিকা মতবাদ (**Role theory**) সমর্থন করেন যাঁরা, তাঁদের বক্তব্য এই যে, দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যেভাবে কাজ করে, তা প্রধানত রঙ্গমঞ্চের ভূমিকারই মত। নাট্যসংলাপ, পরিচালকের নির্দেশ, সহ-অভিনেতাদের সহযোগিতা, দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার মনোসামাজিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ কোনও অভিনেতার ভূমিকা যেমনভাবে রূপায়িত হয়ে ওঠে, সমাজে বৃদ্ধদের কর্মপ্রবণতার ভূমিকাও সেইভাবে মর্যাদালাভ করে।

সমাজ-বিজ্ঞানীরা বৃদ্ধদের কর্মপ্রবণতার বিভিন্ন মর্যাদাস্তর নির্ধারণ করতে গিয়ে এই

'ভূমিকা মতবাদ' প্রয়োগ করে সন্তোষলাভ করেছেন। সমাজ পরিবেশের মধ্যে যেরকম পরিস্থিতিতে বৃদ্ধ মানুষ বসবাস করেন, তার প্রতি যথাযথ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর কর্মপ্রবণতা। সমাজে বৃদ্ধ মানুষকে সকলে কি চোখে দেখে, কিভাবে তাঁর কাজকর্মের মূল্যায়ন করে — এসব থেকেই বৃদ্ধ মানুষ কাজের প্রতি আগ্রহ ও সামর্থ্য ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। নিজেকে সমাজদর্পণে যেভাবে প্রতিফলিত দেখবেন, বৃদ্ধ মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেইভাবেই নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্যোগী হবেন, সেবিষয়ে সত্যিই কোন সন্দেহ নেই।

ঠিক এই রকম আরও একটি চিন্তাধারা আছে যা থেকে পরিচায়ক মতবাদ (Labelling theory) গড়ে উঠেছে। যদিও এই মতবাদ অনুসারে সচরাচর অপরাধমূলক এবং মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরই শ্রেণীবিভাগ করা হত, তবে ইদানীং বৃদ্ধদের শ্রেণীবিভাগেও এই পরিচায়ক মতবাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৃদ্ধ মানুষকে সমাজ 'বৃদ্ধ', 'অক্ষম', 'অথর্ব', প্রভৃতি যেরকম পরিচায়ক সংজ্ঞায় বিঘোষিত করবে, বৃদ্ধ মানুষরাও স্বভাবতই সেইভাবে সমাজমনের পরিচায়িকা মেনে নিতে বাধ্য হবেন এবং তাঁদের কর্মপ্রবণতায় সেই মানসিকতা অবশ্যই প্রতিফলিত হবে।

কোনও বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি সমাজের ঐ পরিচায়ক সংজ্ঞা না মেনে স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করতে সচেষ্ট হন, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজ তাকে হাস্যাস্পদ করে তুলতে পারে এবং তার ফলে তাঁর বার্ধক্যের অক্ষমতার গ্লানি যেন আরও বদ্ধমূল হবে।

সুতরাং পরিচায়ক মতবাদ যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁরা সম্ভবত সতর্ক করে দিতে চান যে, একবার কোনও বৃদ্ধ মানুষকে 'অথর্ব', 'অক্ষম' বলে ঘোষিত করা হলে, তাঁর কাছ থেকে স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আর আশা থাকে না এবং সত্য সত্যই, পরিচায়ক সংজ্ঞায়নের ফলে বৃদ্ধ সমাজের অশেষ ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।

এসব মতবাদের সমালোচনা-পর্যালোচনা করে ইদানীং সমাজবিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষবিস্তার (Phenomenological) মতবাদ গড়ে তুলেছেন। এই মতবাদের সারকথা হল এই যে, মানুষের প্রত্যক্ষজ জ্ঞান, অনুভূতি, উপলব্ধি এসব থেকেই আচরণ-বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করে। সুতরাং বৃদ্ধ মানুষেরও আচরণ বিশ্লেষণ করতে হলে তাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধির স্বরূপ বুঝতে হবে এবং তাহলেই তাঁকে সার্থক পরিতৃপ্তির পথপ্রদর্শন করা যাবে।

এই মতবাদ খুবই অমূর্ত চিন্তার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে, সেজন্য সকলে একে বৈজ্ঞানিক মতবাদ বলে এখনো মানতে চাইছেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে

হবে যে, সমাজবিজ্ঞানে বৃদ্ধ মানুষদের সার্বিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা উপলব্ধির ভিত্তিতে তাঁদের মর্যাদা নিরূপণের চেষ্টা খুবই ন্যায়সঙ্গত পন্থা বলে স্বীকৃত হবেই।

প্রত্যক্ষ-বিস্তার মতবাদ চাইছে বৃদ্ধদের প্রতি আরও সহানুভূতিসম্পন্ন হতে, — যার ফলে বৃদ্ধ মানুষকে বোঝা যাবে এবং তাঁর চাহিদা পূরণের সার্থক প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যাবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ-বিস্তার মতবাদ যতই দুর্বোধ্য মনে হোক, মূলত এই মতবাদের অন্তর্নিহিত নীতি সন্দেহাতীত সত্য এবং সকল মতবাদের সারমর্ম বলেই সকলে ক্রমশ স্বীকার করছেন।

॥ অধ্যায় ৪ ॥
জৈবিক ও শারীরবৃত্তিক চিন্তা

বয়স বাড়তে থাকলে মানুষের নানারকম পরিবর্তন হতে থাকে। এই সব পরিবর্তন-গুলির মধ্যে মানুষের কাছে সবচেয়ে আতঙ্কজনক হল তার জৈবিক ও শারীরবৃত্তিক পরিবর্তনগুলি। মানব সমাজে যৌবনের শারীরবৃত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলিরই ব্যাপক প্রশংসা করা হয়, তাই বৃদ্ধ বয়সের লোলচর্ম, শিরাস্ফীতি, কেশহীনতা ইত্যাদি লক্ষণগুলির সঙ্গে মানুষকে মানিয়ে নিয়েই চলতে হয়। এই সমাজে স্বাবলম্বী মানুষেরই মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে, সুতরাং বৃদ্ধ বয়সের পরনির্ভরশীলতাকেও মেনে নিতে হয় এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পেলেও তা নিয়ে মনঃক্ষুণ্ণ হলে চলে না।

অনেকেই মনে করেন, দৈনন্দিন ব্যবহারজনিত জৈবিক ক্ষয়ক্ষতির জন্যই দেহের বিভিন্ন অংশ জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বার্ধক্যের লক্ষণাদি দেখা দেয়। অবশ্য একথা সর্ব-জনগ্রাহ্য হয়নি। কারণ দেখা গেছে, হৃদযন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্রে দৈনন্দিন ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু কোন কোন ব্যক্তির দেহের বৃক্ক বা রেচনযন্ত্রের কোন ক্ষয়-ক্ষতিই সারাজীবনে দেখা যায় না। তাহলেও জরা অথবা বার্ধক্যের লক্ষণ সেই মানুষের দেহেও নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়।

নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করলে দেহের জৈবিক বার্ধক্যের লক্ষণগুলি অনেকাংশে বিলম্বিত করা যায়, একথাও মনে রাখা দরকার।

বার্ধক্য লক্ষণের আর একটি মতবাদে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে দেহমধ্যে হরমোন (hormone) বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণের ভূমিকা সম্পর্কে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে হরমোন রসক্ষরণও কমতে থাকে, সেজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে হরমোন চিকিৎসা করে বার্ধক্যের লক্ষণাদি দূর করার প্রচেষ্টা কিছুটা সফল হয়েছে।

দেহের সংযোগকারী বিভিন্ন কলা বা টিস্যুর মধ্যে প্রোটিনের অভাব ঘটলে কর্ম-ক্ষমতা কমে যায়। প্রোটিনজাতীয় শারীরবৃত্তিক পদার্থগুলির মধ্যে কোলাজেন (Collagen) হল প্রধান। দেহের সমগ্র প্রোটিন সত্তার ৩০ শতাংশই হল এই

কোলাজেন। এই পদার্থের পরিবর্তন বা অভাব ঘটলে দৈহিক কাঠিন্য জাগে এবং তাতে বার্ধক্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই কোলাজেন মতবাদ বহুদিন থেকেই বিজ্ঞানীদের সমর্থন লাভ করে আসছে, কারণ তাঁদের ধারণা, বিভিন্ন কলায় পুষ্টি সরবরাহ এবং রেচন প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে বলে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে জরা ও বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দেয়।

অনেকে একথাও মনে করেন যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের কোষবিভাজনের প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। ঐ সকল কোষবিভাজনের মাধ্যমেই নানাপ্রকার প্রতিদেহ (অ্যানটিবডি, antibody) কোষ সৃষ্টি হতে থাকে। এটি এক ধরনের জৈবিক স্বপ্রতিরোধ (auto-immunity) ব্যবস্থা এবং এই মতবাদ অনুসারে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, এই কোষবিভাজন ও প্রতিদেহ (অ্যানটিবডি) সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দেহের মধ্যে রোগ প্রতিরোধের স্বনির্ভর ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকলেও এই প্রক্রিয়া থেকেই পরিণামে দেহ ধ্বংসপ্রাপ্তির পথে অগ্রসর হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াটিকে স্তিমিত করতে পারলে আয়ু দীর্ঘায়িত হতে পারে।

এই ধরনের নানাপ্রকার বার্ধক্য মতবাদ গড়ে ওঠা সত্ত্বেও বার্ধক্যের জৈবিক ও শারীরবৃত্তিক কারণ-রহস্য সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবৈষম্য রয়ে গেছে।

বার্ধক্য সকল ক্ষেত্রে দেহের আভ্যন্তরীণ জৈবীয় কারণ থেকেই যে উৎপন্ন হয়, তা নয়। অন্তত কোন কোন ক্ষেত্রে বার্ধক্যের কারণ ঘটে কোনও দেশের জনমানুষের জীবনধারণ পদ্ধতির ফলে। যেমন, নিয়মিত ব্যায়ামচর্চার অভাব, সুষম খাদ্যাভ্যাসের অভাব, অত্যধিক ধূমপান, ইত্যাদি। এসব কারণে হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা ঘটে এবং এদেশে বার্ধক্য ও আকস্মিক মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হল হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা। এছাড়া, অপরিমিত পশুমাংস আহারের ফলেও প্রোটিনজনিত অতিবিষক্রিয়া (protein intoxication) এবং অতিবিপাক (hyper-metabolism) জনিত কারণে বার্ধক্য ত্বরান্বিত হয়। যেসব সমাজে নিরামিষ আহারের প্রাধান্য বেশি, সেই সমাজের মানুষের হৃদযন্ত্রের দুর্বলতাও তত দেখা যায় না এবং মানুষের আয়ু বেশি হতেও দেখা গেছে। পশ্চিমী দেশে অত্যধিক পরিমাণে পশুমাংস আহারের ফলে মানুষের দেহে যে প্রোটিন অতিবিষক্রিয়া (ইনটক্সিকেশন) হয়ে থাকে এবং তা থেকে হৃদযন্ত্র রোগাক্রান্ত হয়, এই সত্য পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা আজ স্বীকার করছেন। বার্ধক্যের অন্যতম লক্ষণ দাঁত নষ্ট হওয়া, সেটিও ঘটে খাদ্যাভ্যাসেরই ত্রুটি থেকে।

বার্ধক্যের অগ্রগতি দেহচর্মে বেশ সুস্পষ্টভাবেই ফুটে ওঠে। দেহচর্মের সঙ্কোচন, বিবর্ণতা, শুষ্কতা, লোমহীনতা, অল্প আঘাতেই ক্ষত সৃষ্টি এবং ক্ষত নিরাময়ে বিলম্ব

ইত্যাদি লক্ষণ বার্ধক্যের। দেহচর্মের নিচে চর্বির অভাব ঘটতে থাকে, বিশেষত হাতের ত্বকেই এই লক্ষণ দেখা যায়। চক্ষুকোটরে চর্বির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার দরুন চক্ষুগোলক কোটরাবিষ্ট হয়ে যায় (চোখ বসে যায়) এবং তার ফলে সর্বদিকেই দৃষ্টিক্ষমতা হ্রাস পায়। চোখের পাতাও সামান্য ঝুলে পড়ে বলে দৃষ্টিক্ষমতা ব্যাহত হয় বৃদ্ধদের। চর্বিস্তর হ্রাস পেতে থাকে বলেই শয্যাশায়ী বৃদ্ধ রোগীদের শয্যাক্ষত হয়ে যায়। ঘর্ম-গ্রন্থিগুলির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় বলে বৃদ্ধরা ঘামেন কম, সুতরাং দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তাঁরা কষ্ট পান খুব বেশি। আবার ঠিক সেই কারণেই এবং রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা কমে বলে সর্দি-কাশিতেও তাঁরা সহজে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম এবং দারুণ শীতের কষ্ট তাঁরা এই কারণেই সহ্য করতে পারেন না, ফলে, গ্রীষ্মে ও শীতে বৃদ্ধদের মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়।

বার্ধক্যে মুখচর্মের সঙ্কোচন লক্ষণ সম্পর্কে অনেকে বলেন, মানুষের জীবনে নানা-প্রকার ভাব-অভিব্যক্তির অনবরত অভ্যাসের ফলে মুখের চর্মস্তরে তার প্রতিরূপ আঁকা হয়ে যায় সঙ্কোচন আকারে। হাসি, বিরক্তি, ভ্রূভঙ্গি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাব-অভিব্যক্তির মুখভঙ্গিতে মুখচর্মে বিভিন্ন প্রকার সঙ্কোচনের সৃষ্টি হয়। কোন মানুষ এই সকল বিশেষ মুখভঙ্গি কোনও বিশেষভাবে নিয়মিত অভিব্যক্ত করতে থাকলে বার্ধক্যের মুখচর্ম সঙ্কোচনে তা সেই ভাবই প্রতিফলিত হয়ে যায়।

চুলের জৈবীয় বা শারীরবৃত্তিক কাজ ছাড়া আরও কয়েকটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য আছে। চুলের পরিমাণ, রঙ, অথবা চুল বিন্যাসের ধরন দেখে অনেকে মানুষের চরিত্র বিচার করেন। বয়স বাড়লে মাথার এবং দেহের কেশহীনতা প্রায় অবশ্যম্ভাবী। পুরুষদের মুখের দাড়ির বৃদ্ধি কমে যায়। মহিলাদের দেহের অ্যানড্রোজেন/ইসট্রোজেনের অনুপাত পরিবর্তিত হতে থাকার ফলে মুখমণ্ডলে কোন কোন ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত কেশ উদ্ভব হতে পারে। এছাড়া, চুলের কাল রঙ সৃষ্টির কোষগুলিতে ক্রমেই কর্মক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকায় চুল সাদা হতে থাকে।

দেহের পেশী সম্পর্কে যে সকল গবেষণাদি হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায়, ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের দেহের পেশীগুলি সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। এর পর থেকে পেশীর ক্ষমতা, পুষ্টতা, নমনীয়তা এবং দৃঢ়তা কমতে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে এজন্যই পেশী সঞ্চালনমূলক কাজে দক্ষতা হ্রাস পায়। নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করতে থাকলে অবশ্য এই দক্ষতা বেশ কিছুটা অটুট রাখা যায়।

দেহের সংযোজক ও পেশীকলাগুলি দেহকে দৃঢ়সংবদ্ধ করে রাখে, পুষ্টি সঞ্চিত রাখে এবং দেহের বিভিন্ন প্রান্তে পুষ্টি সরবরাহ ক'রে, রক্ত উৎপাদন ও সঞ্চালন করে। বার্ধক্য

এলে ঐ সংযোজক ও পেশীকলাগুলি অনমনীয় হয়ে পড়তে থাকে এবং পুষ্টি সঞ্চালনের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

বৃদ্ধ হলে পরিপাক শক্তিও আগের মত কার্যকর থাকে না। ঘ্রাণ বা আস্বাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে খাওয়ার আগ্রহ কমে যায়। বার্ধক্যজনিত দাঁতের অস্বস্তি বা আর্থিক অস্বচ্ছলতা উপযুক্ত ধরনের খাদ্য গ্রহণের অন্তরায় হতেও পারে। এসব কারণে পরিপাকের গোলযোগ দেখা দিলে বার্ধক্যের পরিণাম বলে মনে করা ভুল।

বয়স বৃদ্ধি পেলে দেহের মধ্যে পরিপাকের সহায়ক পাচক রসক্ষরণ ও লালা নিঃসরণ কমতে থাকে। যথাযথভাবে খাদ্যদ্রব্য চিবোতে না পারার জন্য বৃদ্ধদের পরিপাক ব্যাহত হয়। এজন্য বৃদ্ধ বয়সে অনেককেই পরিপাকের সহায়ক অন্য ধরনের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করে নিতে হয় এবং খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতেই হয় স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে।

বৃক্ক বা কিডনীর কাজ হল রক্ত থেকে দূষিত বর্জনীয় পদার্থ মূত্রের আকারে দেহের বাইরে রেচন করে দেওয়া। এই রেচন কার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন না হলে মানুষ ব্যাধিগ্রস্ত হয় এবং মৃত্যুমুখী হয়। ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রেই বার্ধক্যে বৃক্ক কর্মক্ষমতা হারায়। বৃক্কের কোষগুলি কমতে থাকে এবং বৃক্কে রক্ত সরবরাহও কমে আসে। এইজন্য বৃদ্ধ বয়সে বৃক্কের নানাপ্রকার গোলযোগ শুরু হয়।

দেহের বর্জনীয় পদার্থ মলের সঙ্গেও নির্গত হয় দেহ থেকে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে পুষ্টি সঞ্চয়-প্রক্রিয়া কার্যক্ষমতা হারায় বলে অনেক ক্ষেত্রে রেচন মাধ্যমে পুষ্টিও বেরিয়ে যায় দেহ থেকে। যেসব পেশীর কার্যকারিতার ফলে মল রেচনকার্য সহজ হয়, বৃদ্ধ বয়সে সেইসব পেশীর নমনীয়তা হ্রাস পায় বলে মল ত্যাগ ব্যাহত হয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। উপযুক্ত খাদ্য ও ব্যায়ামের অভাব এবং নানাপ্রকার মানসিক ও পরিবেশজনিত কারণেও কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে।

ফুসফুসের কর্মক্ষমতা ঠিক থাকলে দেহের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে অকসিজেন গৃহীত হতে থাকে। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের সেই কর্মক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে বলে বৃদ্ধ মানুষ শ্বাসগ্রহণের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে অকসিজেন নিতে পারেন না। ফলে, দেহের বিপাক (মেটাবলিজম) যথাযথ হয় না।

হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য রক্তবাহের দ্বারা রক্ত সংবহন হয়। বয়স বৃদ্ধি হতে থাকলে হৃদ্‌সংবহন প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার ফলে, কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করা বৃদ্ধ বয়সে অসম্ভব হতে থাকে। রক্তবাহী ধমনীকাঠিন্যের জন্যই রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়; সুতরাং রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ধারণাটি ভুল।

মস্তিষ্কের মধ্যেও বৃদ্ধ বয়সে বেশ কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয়। মস্তিষ্কের পরিমাণ এবং ওজন কমে যায়, কারণ মস্তিষ্কের কোষগুলির সংখ্যা কমতে থাকে। ফলে, কোনও বিষয়ে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে বৃদ্ধ বয়সে কিছু বেশি সময় লাগে।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে দৃষ্টিশক্তিও হ্রাস পেতে থাকে, তার কারণ, চোখের মধ্যে কিছু শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটে। দৃষ্টিবাহী স্নায়ুগুলির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, চোখের মধ্যে ক্রিস্ট্যালাইন লেন্সের স্বচ্ছতা ও স্থিতিস্থাপকতা (ইলাসটিসিটি) কমে যায়, এবং তারারন্ধ্র ছোট হয়ে যায় ; সেজন্য চোখের মধ্যে দিয়ে বেশি আলো যেতে পারে না। চোখে ছানিও পড়ে প্রায় ৬০ শতাংশ বৃদ্ধেরই। চোখের মধ্যে কাচীয় তরল পদার্থ (ভিট্রিয়াস হিউমার) ঘোলাটে হয়ে যেতেও পারে এবং তাতে হালকা রঙের ভাসমান কোষ সৃষ্টি হতে পারে — যার ফলেও দৃষ্টিস্বচ্ছতা হ্রাস পায় বার্ধক্যে।

শ্রবণশক্তির কর্মক্ষমতা কমতে থাকে যৌবনোত্তর বয়স থেকেই। বৃদ্ধ বয়সে প্রায় ২৫ শতাংশ লোকেরই বিশেষভাবে শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়। অন্তঃকর্ণের কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার জন্যই এরকম হয়ে থাকে। রক্তবাহী ধমনীগুলি রক্তসংবহন কাজে যথেষ্ট কর্মক্ষম থাকে না এবং শ্রবণ স্নায়ুও দুর্বল হয়ে পড়ে। কানের ভেতরে ছোট ছোট অস্থিগুলির চুনবিকৃতি (ক্যালসিফিকেশন) হতে থাকলেও শ্রবণশক্তি ব্যাহত হয়। কানের কোনও অসুখ বা দুর্ঘটনা থেকেও শ্রবণ-দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। কেউ কানে কম শুনলে অনেকেই তাকে বার্ধক্যের লক্ষণ বলে চিহ্নিত করে থাকেন। এই ধারণা সব সময়ে ঠিক নয়।

তবে শ্রবণশক্তি দুর্বল হলে বৃদ্ধ মানুষ তো বটেই, সকল মানুষেরই বিষাদ বোধ জাগে। কারণ, যাদের দুর্বল শ্রবণশক্তি, সমাজে তাদের মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নানাভাবে। এই কারণে বৃদ্ধ বয়সে শ্রবণশক্তি দুর্বল হলে অনেকে মর্যাদাহানির আশঙ্কায় নিজেকে সমাজ থেকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন করে রাখেন এবং তার ফলে নানাপ্রকার মনোবিকারও সৃষ্টি হয়। শ্রবণ দুর্বলতার ফলে অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শব্দ ভালভাবে শুনতে না পেলে বৃদ্ধদের জীবনে নানাপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটেও যায়। এজন্য প্রয়োজন উন্নত ধরনের শ্রবণসহায়ক যন্ত্রের ব্যবহার, প্রশান্ত পরিবেশ, সহজ সরল মৌখিক আলাপ-আলোচনা অর্থাৎ মুখোমুখি সামনাসামনি কথাবার্তা — যাতে ভাব বিনিময়ে ত্রুটি ঘটতে না পারে।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাদগ্রহণের সূক্ষ্ম বিচার শক্তিও কমতে থাকে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। সম্ভবত ক্ষুধামান্দ্য বা অত্যধিক ধূমপান কিংবা বেশি মশলাযুক্ত

খাদ্যগ্রহণের পরিণামে এরকম হতেও পারে। তবে, বৃদ্ধ হলেই আস্বাদন ক্ষমতা কমতে থাকে, গবেষণালব্ধ তথ্য একথা সমর্থন করে না।

গন্ধ বিশ্লেষণের ক্ষমতাও বার্ধক্যে সকল ক্ষেত্রে কমে যায় না। তবে নানাপ্রকার ব্যাধিবিকারের জন্য কোনও কোনও বৃদ্ধ ব্যক্তির ঘ্রাণশক্তি ক্ষীণতা লাভ করে। সেটা বার্ধক্যের সাধারণ লক্ষণ বলে স্থির করা চলে না।

॥ অধ্যায় ৫ ॥

সাধারণ স্বাস্থ্য

'স্বাস্থ্য' কাকে বলে বোঝানো সহজ নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, স্বাস্থ্য বলতে বোঝায় পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা এবং কেবলমাত্র ব্যাধি বা অক্ষমতা না থাকাটাই স্বাস্থ্য নয়।

কিন্তু একই ব্যক্তির একটি জীবন পর্যায়ে যে অবস্থাটি 'ভাল' স্বাস্থ্য, তাঁর জীবনের পরবর্তী কোনও পর্যায়ে সেই অবস্থাটিকেই 'খারাপ' স্বাস্থ্য বলে চিহ্নিত করা হতেও পারে। আবার, একজনের পক্ষে যেটা 'ভাল' স্বাস্থ্যের লক্ষণ, অন্যজনের পক্ষে সেটাই 'খারাপ' স্বাস্থ্য হতে পারে। অথবা বিপরীত ব্যাপারও ঘটতে পারে। অসুখের আতঙ্কে যাঁরা ভোগেন (হাইপোকন্ড্রিয়াক), তাঁরা ডাক্তারী-পরীক্ষায় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বলে গণ্য হলেও নানারকম ব্যাধির অভিযোগ তাঁরা প্রায় প্রতিদিনই করে থাকেন।

বৃদ্ধ বয়সে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হতে থাকে, এমন ধারণা হওয়াটাই সহজ এবং স্বাভাবিক। সত্যিই, পরিণত বয়সে সকলেরই অবশ্যই কিছু কিছু শারীরিক অবনতি ঘটতে থাকে ; তবে তা থেকে একথা বলা যায় না যে, মানুষ তাতে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। শারীরিক অবনতির জন্য বৃদ্ধ মানুষের জীবনের কর্মধারার মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা উপস্থিত হতে পারে, কিন্তু নিরীক্ষালব্ধ তথ্যাদি পর্যালোচনা করে একথাও যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে আজ বলা চলে যে, বৃদ্ধ ব্যক্তিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত জীবনধারা বা পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে পারেন অথবা যথোপযুক্ত ঔষধপথ্য এবং চিকিৎসাদির মাধ্যমে তাঁরা বেশ সক্ষম হয়ে থাকতে পারেন।

সমবয়সী লোকদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে তুলনা করে বৃদ্ধদের নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধই বলবেন, তাঁদের স্বাস্থ্য সমবয়সী অন্যদের থেকে অনেক ভাল। মাত্র ১০ শতাংশ বৃদ্ধ হয়তো বলবেন স্বাস্থ্য ভাল নয়। অর্থাৎ সমবয়সী বৃদ্ধদের সময়ভিত্তিক বয়স (chronological age) সমান হলেও নানাকারণে

তাদের মধ্যে শারীরভিত্তিক বয়স (physiological age)-এর তারতম্য ঘটেই থাকে।

বৃদ্ধ বয়সে সাধারণত ভাল স্বাস্থ্য আর আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ অনুবন্ধ অবশ্যই থাকে। যাঁদের আর্থিক দুশ্চিন্তা নেই, বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ভালই থাকে। বার্ধক্যে অভাব-অনটনের জীবনে স্বাস্থ্যহানি দ্রুত ঘটে, এ সত্য সমাজ জীবনে কারুরই অজানা নয়। শারীরভিত্তিক বয়োবৃদ্ধির নানারকম লক্ষণ তাঁদের ব্যক্তিত্বে ফুটে উঠতে থাকে।

বার্ধক্যে রোগভোগের অন্যতম প্রধান অস্বস্তি হল এই যে, একাধিক দীর্ঘকালীন পুরনো আধিব্যাধি এই পর্যায়ে দেহকে জর্জরিত করে থাকে। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল — বাতব্যাধি, শ্রবণদুর্বলতা, দৃষ্টিক্ষীণতা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদযন্ত্রের ও শ্বাস-যন্ত্রের গোলযোগ ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি হয় বাতব্যাধি, তাও পুরুষদের মধ্যেই বেশি; বৃদ্ধাদের ঐ ব্যাধি কম হয়।

এক্ষেত্রেও নিরীক্ষালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায়, বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক অনটন যাঁদের কম, পুরনো আধিব্যাধির প্রকোপও তাঁদের মধ্যে কম হয়। শিক্ষিত বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যেও দীর্ঘকালীন পুরনো আধিব্যাধির আক্রমণ কম হয়।

বার্ধক্যজনিত এইসব আধিব্যাধি থেকে স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হলে কতকগুলি অভ্যাস-চর্চা করা যেতে পারে, যার ফলে বৃদ্ধ বয়সেও কর্মক্ষমতা অনেকাংশে অটুট থাকে। এই ধরনের অভ্যাস-চর্চার মধ্যে একটি হল নিয়মিত যোগাসন ও ব্যায়াম অনুশীলন।

ব্যায়ামচর্চা সম্পর্কে বৃদ্ধদের মনে কিছু ভুল ধারণা আছে। তাঁরা অনেকেই মনে করেন, বেশি বয়সে শারীরিক ব্যায়াম করলে দেহের অত্যধিক ক্ষয় হয় এবং পেশী ও অস্থিগুলি ঝাঁকুনির ফলে শিথিল হয়ে যেতে পারে। এজন্য তাঁরা বার্ধক্যের উপযুক্ত অবসর বিনোদন হিসাবে তাস, দাবা নিয়ে সময় কাটাতে চান। হৃদযন্ত্রের কষ্ট হবে মনে করেও বৃদ্ধ ব্যক্তিরা শারীরিক ব্যায়ামচর্চায় আগ্রহী হতে পারেন না।

কিন্তু শারীরবিদ যাঁরা, তাঁরা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে আজ এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সকল বয়সেই শারীরিক ব্যায়াম বিশেষভাবে উপকারী এবং অপরিহার্য। বৃদ্ধরা শারীরিক ব্যায়ামচর্চায় অবহেলা করে নিজেদেরই কষ্ট বাড়িয়ে তোলেন মাত্র। ব্যায়ামবিদ্‌রাও মনে করেন, বৃদ্ধরা নিয়মিতভাবে ব্যায়ামচর্চাকে তাঁদের জীবনধারার অঙ্গীভূত করলে উপকৃতই হবেন। যৌবনকাল থেকে স্কুলে কলেজে ছেলে-মেয়েদের মনে এ বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করে দেওয়া উচিত যে, ব্যায়ামচর্চা

আজীবন করে যেতে হয়। স্কুল-কলেজের পি. টি. (ফিজিক্যাল ট্রেনিং) ক্লাস শেষ হয়ে গেলেই ব্যায়ামচর্চার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না।

আজকাল নানাপ্রকার শ্রমলাঘবকারী আধুনিক কলাকৌশলের কল্যাণে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন কমে গেছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে স্নান করতে গেলেও কষ্ট করে মাথায় জলটি ঢালতে হয় না, হাতের কাছে কলটি ঘোরালেই ঝরণার মত মাথার ওপর জল ঝরে পড়ে স্নান করিয়ে দেয়। রান্না করতে গেলে কাঠ কাটতে হয় না, কয়লাও ভেঙে নিতে হয় না—বোতামটি টিপে দিলেই গ্যাস বা বিজলীর আগুনে রান্না হয়ে যায় অল্প সময়ে। ঘরকন্নার নানা কাজেও আজকাল শারীরিক পরিশ্রম অনেক কমে গেছে।

সেই কারণেই নিয়মিত শরীরচালনা করে, রক্তসংবহন বাড়িয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা বজায় রাখার প্রয়োজনেই বৃদ্ধ বয়সেও ব্যায়ামচর্চা করে যাওয়া উচিত। তাতে অবশ্যই শরীর ও মন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে। বার্ধক্যে স্বাস্থ্যভঙ্গের অন্যতম কারণ এই যে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অবহেলাজনিত অক্ষমতার সৃষ্টি হয়। বয়স বাড়তে থাকলে শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজগুলি ক্রমে সন্তানদের ওপর ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধরা আরাম কেদারায় বিশ্রাম উপভোগের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন।

ফলে, অধিকাংশ লোকেরই বৃদ্ধ বয়সে তন্দ্রাচ্ছন্ন নিস্তেজ নিরুদ্যম ভাব জাগে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে, কোনও পেশাদার ক্রীড়াবিদও যদি অবসর উপভোগের ইচ্ছায় মাত্র কয়েক সপ্তাহ নিষ্কর্মা হয়ে শুয়ে বসে সময় কাটান, তাহলে অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে তাঁর শারীরিক কর্মক্ষমতার অবনতি ঘটে এবং উদ্যম কমে যায়। ক্রীড়াবিদের মত কোনও কর্মঠ মানুষের জীবনেই যদি মাত্র কয়েকটি সপ্তাহের নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম-অবসর যাপনের এই পরিণাম হয়, তাহলে সহজেই অনুমান করা যায়, কোনও বৃদ্ধ মানুষ মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিশ্রাম-প্রাচুর্যের জীবনধারায় নিজের কর্মক্ষমতার কতখানি সর্বনাশা অবনতি ঘটতে দেন স্বেচ্ছায়।

বৃদ্ধ বয়সে পরিমাণমত নিয়মিত শারীরচর্চা এবং ব্যায়াম অনুশীলন করতে থাকলে যেসব উপকার হয়, সেগুলি কম নয়। যেমন :

(১) উন্নত স্বাস্থ্য লাভ হয়,

(২) হৃদ- ও রক্তসংবহন প্রক্রিয়া ভাল থাকে,

(৩) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অকস্মাৎ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়,

(৪) রক্তচাপ কম থাকে,
(৫) অসুস্থ হলে বা হৃদযন্ত্রের গোলযোগ হলেও সহজে সামলে ওঠা যায়,
(৬) শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া ভাল থাকে,
(৭) গভীর এবং দীর্ঘ নিদ্রালাভ হয়,
(৮) উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং মানসিক অস্থিরতা কমে যায়,
(৯) দেহপেশীগুলি মজবুত ও সহনশীল হয়,
(১০) রক্তের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়,
(১১) দেহচর্মের বিকৃতি কম হয়,
(১২) দেহে অপরিমিত চর্বি সঞ্চয় হতে পারে না,
(১৩) অঙ্গভঙ্গিমা সুঠাম থাকে,
(১৪) দেহসন্ধিগুলির সচলতা অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং
(১৫) প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ, কল্পনাচিন্তা, আত্মমর্যাদাবোধ, স্বনির্ভরতা প্রভৃতি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিও উন্নত হয়।

ব্যায়াম ও শারীরচর্চার ফলে যেসব উপকার হয়, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বোধ হয় এই যে, ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরে অকসিজেন গ্রহণকার্য বৃদ্ধি পায়। দেহের শক্তির ও তাপসৃষ্টির মূল উপাদান হল অকসিজেন। বার্ধক্যে হৃদসংবহন এবং শ্বাস-প্রক্রিয়ার অবনতি ঘটে বলে দেহমধ্যে অকসিজেন গ্রহণের পরিমাণ কমে যায়, এবং অকসিজেনের স্বল্পতার জন্যই বার্ধক্যের অন্যান্য অবনতির লক্ষণগুলি জাগতে থাকে, যেমন — বুদ্ধিভ্রংশ, অকর্মণ্যতা, অসহনীয়তা, অবসাদ ইত্যাদি। সপ্তাহে দিন চার-পাঁচ মাত্র আধঘণ্টা করেও ব্যায়ামচর্চা করলে দেহমধ্যে অকসিজেন স্বল্পতা দূর করে সজীবতা ফিরিয়ে আনা যায় এবং বৃদ্ধ বয়সেও তাতে কোন ক্ষতি হয় না।

খাদ্যাভ্যাসও বার্ধক্যে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বহুলাংশে দায়ী। খাদ্যের একটা সামাজিক বৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য আছে। খাদ্যপ্রস্তুতের কাজে সমাজের সহযোগিতা অপরিহার্য। খাদ্য-প্রস্তুত প্রণালীর মাধ্যমে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, খাদ্য পরিবেশন করেও তেমনি আনন্দ। বৃদ্ধ বয়সে খাদ্যসংক্রান্ত এই সমস্ত সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি আর তেমন উপভোগ করা যায় না। ডাক্তারের পরামর্শে অথবা কোনও স্বজন বিয়োগের পরিণামে সামাজিক কারণে বৃদ্ধ বয়সে কতরকম খাওয়ার অভ্যাস অকস্মাৎ বদলে ফেলতে হয়। তাতে খাদ্য-গ্রহণের আনন্দ তৃপ্তি কমে যাওয়ার ফলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

খাদ্যের পুষ্টিকারিতা বিচার করে বৃদ্ধ বয়সে এইজন্যই খাদ্য নির্বাচন করতে হয়। কেবল রুচিপছন্দ বিচার করলেই চলবে না। বৃদ্ধরা সাধারণত মিষ্টান্ন খেতে ভাল-

বাসেন, কারণ জিভের স্বাদকোরকগুলির মধ্যে মিষ্ট আস্বাদনের কার্যকারিতা অন্যান্য আস্বাদনের চেয়ে কিছু বেশি স্থায়িত্ব লাভ করে থাকে। সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে মিষ্টান্ন আহারের প্রতি এই সর্বজনবিদিত প্রবণতার ফলে দেহের অনাবশ্যক স্থূলতা বৃদ্ধি পেয়ে স্বাস্থ্যের ভারসাম্য নষ্ট করে।

বার্ধক্যে দেহের স্থূলতা বৃদ্ধির আরও একটি কারণ হল, এই পর্যায়ে দেহমধ্যে ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন কমতে থাকে, কিন্তু বিগত জীবনধারায় অভ্যস্ত উচ্চ ক্যালরিসম্পন্ন খাদ্যাদি গ্রহণের চর্চা তো থেকেই যায়। বিশেষত বৃদ্ধা মহিলাদের দেহের স্থূলতা এই সব কারণেই ঘটে থাকে।

বৃদ্ধ বয়সে স্থূলদেহের সমস্যা অনেক। বাতব্যাধি হলে স্থূল দেহ আরও কষ্ট বৃদ্ধি করে। চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়। সহজেই অবসাদ জাগে। ফলে, বিষাদ মনোবিকারও সৃষ্টি হয় এবং আয়ু হ্রাস পায়। স্থূলদেহী বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যথাযথভাবে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন না। তার ফলে, অনেক সময়ে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত, এমনকি পঙ্গু হয়ে পড়েন। স্থূলদেহী বৃদ্ধদের ডায়েবেটিস, ধমনীকাঠিন্য, শিরাস্ফীতি, হারনিয়া, হৃদ্‌সংবহন গোলযোগ, আন্ত্রিক ক্ষত, অত্যধিক উৎকণ্ঠা, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়।

খাদ্যাভ্যাসে নানাভাবে পুষ্টির অভাবও ঘটে বৃদ্ধ বয়সে। এই বয়সে প্রায়ই এমন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করা হয়, যাতে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টিসাধক উপাদানগুলি খুবই কম থাকে। শিক্ষিত স্বচ্ছল পরিবারের বৃদ্ধদের পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই বেশ প্রশংসনীয়। কিন্তু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেসব বৃদ্ধ জীবনযাপন করেন, তাঁদের পরিপাক শক্তিও ভাল থাকে না, তাছাড়া খাদ্য নির্বাচনেও তাঁরা যথেচ্ছ আচরণ করেন। এখানে খাদ্যগ্রহণের সামাজিক তাৎপর্যের কথা আবার স্মরণ করা যেতে পারে।

রুচিমত খাদ্যসংগ্রহ বা প্রস্তুত করার অক্ষমতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে সমাজ-বিচ্ছিন্ন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার খাদ্যস্পৃহা কমে যায় এবং অর্ধাহারে কোনরকমে দিনযাপন করে চলেন। অর্ধাহারী মানুষের মত এই ধরনের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সহজেই নানাপ্রকার আচরণ-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে থাকেন। এঁরা নিজেদের সদাই বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করেন, সহজেই উত্তেজিত হন, ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে পড়েন, অবসাদ বোধ করেন, সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হয়ে পড়তে থাকেন, উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কষ্ট পান, সঙ্কটকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না এবং আপনজনের কাজকর্মে কোনও প্রকার আগ্রহবোধ করেন না।

সাধারণভাবে বলতে গেলে অধিকাংশ বৃদ্ধ ব্যক্তিরই আচরণে এইসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য

করা যায়। কিন্তু মনে হয়, যথাযথ পরিমাণে রুচিকর এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করাতে পারলে বৃদ্ধদের এই ধরনের আচরণ-বিকার থেকে অনেকাংশেই স্বাভাবিক প্রফুল্লতায় উত্তরণ ঘটান যায়। ক্ষোভের বিষয়, সমাজের বৃদ্ধদের এইসব আচরণ-বিকারগুলি এই ধরনের স্বাভাবিক বৃদ্ধজনোচিত আচরণ বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে ; ফলে, এগুলির পরিচর্যার কোনও ইচ্ছাই সমাজ-মনে জাগে না।

কেবল খাদ্য-গুণের অজ্ঞতার জন্যই বৃদ্ধদের যে অপুষ্টি ঘটে, তাই নয় ; দাঁতের অভাবেও তা হয়। এজন্য অনেক ক্ষেত্রেই বৃদ্ধরা খাদ্যদ্রব্যকে মণ্ড বা ক্বাথ করে নিয়ে আহার করেন। খাদ্যের ঐ ধরনের মণ্ড বা ক্বাথ অবশ্যই আকৃতিরূপে এবং আস্বাদনে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হয় না। তার ফলে, খাদ্যগ্রহণের তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন বিরক্তিকর এক অস্বস্তি। এ থেকেই খাদ্যগ্রহণের স্পৃহা কমে গিয়ে অপুষ্টি জন্মায়। শক্ত জিনিস খেলে দাঁতের গোড়ায় কষ্ট হয় বলে অনেক বৃদ্ধ মানুষকে শাকসব্জী মাংস ইত্যাদি খাওয়া ছেড়েই দিতে হয়। খেলেও দাঁতের অভাবে ভালভাবে চিবোতে পারেন না, ফলে পরিপাক ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়ে বিপত্তি ঘটায়।

বৃদ্ধ বয়সে রোগাতঙ্কের ফলে ওষুধবিষুধের ওপর নির্ভরশীলতা যেন বেড়ে যায়। ওষুধের প্রতিক্রিয়া হয় নানাভাবে। ওষুধ ব্যথাবেদনা সারায়, উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও কমাতে পারে, রোগ প্রশমন ও আরোগ্যে সহায়তা করে। যদিও এইসব শুভ ফল ওষুধ থেকে পাওয়া যায়, তবে একথাও সত্য যে, আধুনিক ওষুধপত্রে এমন কিছু কিছু উপাদান আছে, যা ক্রমাগত ব্যবহার করলে নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়া হয়, যেমন — চুল ওঠা, এলার্জি, বৃক্কের ও যকৃতের ক্ষতি, দেহপঙ্গুতা, আন্ত্রিক ক্ষতসৃষ্টি ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, ওষুধের যথেচ্ছ কমবেশি ব্যবহারের ফলে জীবনহানিও ঘটতে পারে। ধূমপানও বৃদ্ধ বয়সে আয়ুহানির এবং নানাপ্রকার ব্যাধিসৃষ্টির জন্য দায়ী বলে মনে হয়।

উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, মানসিক টানাপোড়েনের ফলেও বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে থাকে। উৎকণ্ঠিত মানসিকতা থেকে পরিপাকক্রিয়াও নিশ্চিতভাবে ব্যাহত হয়। তার পরিণামে আন্ত্রিক ক্ষত সৃষ্টিও হয় এবং স্বাভাবিক হৃদ্‌সংবহন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাতব্যাধির মূলেও উৎকণ্ঠিত স্নায়বিক উত্তেজনা সক্রিয় থাকে, একথা চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অনেকে স্বীকার করেন। উদ্বিগ্ন বৃদ্ধ মানুষের রোগ চিকিৎসাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এবং চিকিৎসার সুফললাভে ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রে মৃত্যু ত্বরান্বিত করে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আপনজনের প্রাণ-বিয়োগ বা রোগব্যাধি, ব্যক্তিগত আঘাত বা অসুস্থতা, কোনও সন্তানের বিবাহ, কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ, যৌন সম্পর্করক্ষায় অসুবিধা, আর্থিক মর্যাদার পরিবর্তন, বাড়ি বদল, ইত্যাদি নানারকম ব্যাপার থেকে বৃদ্ধ বয়সে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মানসিকতা জাগে।

কারণ এই ধরনের পরিস্থিতি অবাঞ্ছনীয় এবং অপরিবর্তনীয়, সুতরাং তা থেকে বৃদ্ধ বয়সের অসহায় বিষাদ মনোবিকার বদ্ধমূল হয়ে যায়।

বৃদ্ধ বয়সের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এজন্য বিশেষভাবে সমাজচিন্তা গড়ে ওঠা খুবই প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ নিয়ে গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। যথাসময়ে মনোযোগী হলে এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা গেলে বহু ক্ষেত্রেই বৃদ্ধ সমাজের রোগভোগ উপশম এবং আরোগ্য লাভ সম্ভব হয়। তার ফলে গোটা সমাজের সামগ্রিক সুখসমৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

হাসপাতালগুলিতে অবশ্য বৃদ্ধ সমাজের জন্য বিশেষ চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা এখনো হয়নি, — এ যাবৎ হয়েছে কেবল শিশু সমাজ এবং নারী সমাজের জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা।

এ থেকে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, চিকিৎসকগণ এখনও বৃদ্ধদের রোগ বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশেষ চিকিৎসার আয়ত্তাধীন করে আনার গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। কারণ, চিকিৎসাশাস্ত্রে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধচর্যা (গেরিয়াট্রিক্স্) এখনও এদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থান করে নিতে পারেনি।

সাধারণভাবে চিকিৎসক সম্প্রদায় আজও মনে করেন, বৃদ্ধদের আধিব্যাধি তো লেগে থাকবেই, তার বিশেষ চিকিৎসা বিলাসিতা মাত্র। খুব কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তখনই মাত্র বৃদ্ধ মানুষকে বিশেষ চিকিৎসার আয়ত্তাধীন করার কথা চিন্তা করা হয়ে থাকে। প্রচলিত সমাজ-মনও সেই ভাবধারার অভিমুখী বলে স্পষ্টই মনে হয়। ফলে, বৃদ্ধ ব্যক্তিরা অল্পস্বল্প স্বাস্থ্যহানির ক্ষেত্রে বিশেষ চিকিৎসার আশায় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ চাইলে বেশ অস্বস্তির মধ্যেই পড়ে যান; তখন তাঁরা বেশ বুঝতে পারেন যে, বৃদ্ধ বয়সের রোগ অস্বস্তির সমস্ত কার্যকারণ সব চিকিৎসক ঠিকমত বোঝেন না।

যে পরিবেশে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বসবাস করতে হয়, তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর সেই পরিবেশের প্রভাবও অনস্বীকার্য। যে পরিবেশে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বিদ্যমান, সেখানে বৃদ্ধ মানুষের স্বাস্থ্য ভাল থাকতে পারে না। নতুন কোনও পরিবেশে গেলেও সেখানকার নতুন ধরনের শব্দ, গন্ধ, আলো, ইত্যাদির প্রভাব অনেক সময় বৃদ্ধ মানুষের পক্ষে সহ্য না হতেও পারে।

পরিবেশের আকৃতি এবং রূপরঙও বৃদ্ধ বয়সের স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বয়োবৃদ্ধির ফলে মানুষের কর্মক্ষমতা সীমায়িত হয়ে আসে বলে এমন পরিবেশ প্রয়োজন, যেখানে নিরাপদে এবং সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধমানুষের থাকা এবং কাজকর্ম করা সম্ভব হতে পারে। যে বাড়িতে উঁচু ধাপের সিঁড়ি, প্রায়ান্ধকার ঘরঘুঁজি, সেখানে বয়োবৃদ্ধ মানুষের পক্ষে

দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যহানি ঘটা অসম্ভব কিছু নয়। এছাড়া, পরিচ্ছন্নতা, কাছাকাছি দোকানপাট, ডাক্তারখানা ইত্যাদি থাকলেও বৃদ্ধ মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল হয়।

বার্ধক্যের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে এই ধরনের নানাপ্রকার আলোচনা থেকে আশা পোষণ করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে না যে, বার্ধক্যের সূচনা থেকেই যথাযথ পরিচর্যা এবং চিকিৎসা হলে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পাওয়া হয়তো সম্ভব। বার্ধক্য থেকে মৃত্যুকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে হলে রোগব্যাধির যথোপযুক্ত চিকিৎসা দরকার এবং সেই কাজে সাফল্য লাভ করতে পারলে সুস্থ দেহমন নিয়ে মানুষের আয়ুষ্কাল সম্ভবত ১২০ বছর থেকে ১৩০ বছর বয়স পর্যন্তও বৃদ্ধি পেতে পারে।

॥ অধ্যায় ৬ ॥

যৌনতা

বার্ধক্যবিজ্ঞানীরা ইদানীং মানুষের বৃদ্ধ বয়সের যৌনতা বোধ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। এর আগে মনে করা হত, যৌনতাবোধ কেবলমাত্র যৌবনকালেরই ধর্ম। বার্ধক্যে যৌনতাবোধ হারিয়ে যায়, এই ছিল ধারণা। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ সাধারণত বয়সের ভারে, নানাপ্রকার আধিব্যাধির জন্য, অবসাদগ্রস্ত শেষজীবনে যৌনকার্যে নিযুক্ত হবার ক্ষমতা ও আগ্রহ থেকে ক্রমেই বঞ্চিত হতে থাকেন বলেই মনে করা হত। যৌনতা-হীন বৃদ্ধ মানুষকে নিয়ে নানাপ্রকার কৌতুক করা হত। বৃদ্ধ মানুষের তরুণী বিবাহ কিংবা বৃদ্ধা মহিলার পক্ষে কোনও তরুণকে বিবাহ করা নিয়ে খুবই বিরক্তি বা বিস্ময় প্রকাশ করা হয়ে থাকে আজও।

মানুষের সমাজ-জীবনে যৌনতা বোধের বিশেষ গুরুত্ব আছে। যৌনতাবোধ এবং যৌন আচরণ যদি কোনও মানুষের জীবনে লুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া হয় ব্যাপক। যৌনতা মানেই যৌনমিলন বোঝায় না। এই আচরণ নানাবিধ ভাব অভি-ব্যক্তির মধ্যে দিয়েও চরিতার্থতা লাভ করতে পারে। হাতে হাত দেওয়া, দেহ স্পর্শ, চটুল বাক্যালাপ, স্নেহন — এ সবেরও মাধ্যমে যৌনতা বোধের স্বীকৃতি বোঝা যায়।

বৃদ্ধ বয়সে মানুষ যখন সমাজে ক্রমেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে থাকেন, তখন তাঁর কাছে যৌন আচরণের মাধ্যমে সামাজিক সঙ্গলাভের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যখন সামাজিক মাপকাঠিতে সবরকম মূল্য মর্যাদা হারিয়ে একান্তে বাস করতে থাকেন, তখন নিজেকে যথাযথ মূল্যবোধে আস্থাবান করে রাখার জন্যও যৌন আচরণের প্রয়োজন হতে পারে। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যদি কোনভাবে মাঝে মাঝে যৌনতাবোধের আস্বাদন পেতে পারেন, তাহলে তাঁদের বিষাদ মনোবিকার অনেকটা লাঘব হয় এবং আত্মহত্যার প্রবণতা হ্রাস পায়।

অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে যৌনতাবোধের অভিজ্ঞতা। বৃদ্ধ মানুষের সুস্থ জৈবিক তথা শারীরবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য এবং কর্মক্ষমতা যেমন যৌনতাবোধের পক্ষে

অপরিহার্য, তেমনি সামাজিক পরিবেশ, আর্থিক পরিস্থিতি, সমাজ সচেতনতা এবং একাধিক মানসিক পরিবর্তনীয় গুণবৈশিষ্ট্যও প্রয়োজন।

পুরুষমানুষের পক্ষে বৃদ্ধ বয়সে যৌনতার চরম তৃপ্তি অর্জনে কিছু বেশি সময় লাগে, একথা সত্য। কিন্তু যৌনবিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ মাধ্যমে জেনেছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে পুরুষদের পক্ষে যৌন উত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব হয়। তবে একই দিনে একাধিকবার যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করা বৃদ্ধ বয়সে সম্ভব না হতেও পারে। এ থেকে বোঝা যায়, বৃদ্ধ বয়সে যৌনতাবোধ সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হওয়ার ধারণা একেবারেই ভুল।

বৃদ্ধা মহিলাদের পক্ষেও দেহলালিত্য হ্রাস পাওয়ার সাথে যৌনতাবোধ হ্রাস পাওয়ার চিন্তা-ভাবনা এসে পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রেও যৌনবিজ্ঞানীরা বলেন, কিশোরী বা তরুণী বয়স থেকেই নিয়মিত যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা-আস্বাদন যেসব মহিলার থাকে, তাঁদের দেহরূপলাবণ্যের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটলেও যৌনতাবোধ লুপ্ত হয় না। তবে যোনিপথের চর্মগাত্র এবং সামগ্রিকভাবে যোনিপথের পেশীকলাগুলি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে যৌনমিলনে বেদনা সৃষ্টি হতে পারে, ফলে, বৃদ্ধা মহিলাদের চরম যৌনতৃপ্তি বা রাগমোচন (orgasm) যৌবনের মত তীব্র হয় না। কিন্তু যৌন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সঙ্গমের আনন্দ, স্ত্রী-পুরুষ মিলন বা সঙ্গমের আনন্দ-পুলক উপভোগের স্পৃহা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না।

বৃদ্ধ বয়সে যৌন আচরণ সম্পর্কে মানুষের চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে একাধিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ধারণা ও বিশ্বাস। ২৫ বছর বয়সে যৌবনকালে যে ধরনের যৌন আচরণকে সমাজে যৌবনের উদ্দামতা বলে অভিহিত করা হয়, ৬৫ বছর বয়সে কোনও বৃদ্ধ সেই ধরনের আচরণ করলে সমাজ তাকেই ব্যভিচারিতা বলে থাকে। সুতরাং সমাজ-মন কিভাবে যৌন আচরণের বিচার করছে, সে কথা মনে রেখে বৃদ্ধরা তাঁদের যৌনতার সজীবতা থাকলেও তা প্রকাশ করতে চান না। বৃদ্ধ বয়সে যৌনতার অভিব্যক্তিকে তাঁরা দূষণীয় এবং লজ্জাজনক বলেই ভাবতে এবং গোপন রাখতে শিখেছেন। এ শিক্ষা তাঁরা পান বার্ধক্যে উপনীত হবার বহু পূর্বেই এবং সেই পূর্বার্জিত বিশ্বাস মতই নিজেদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। বৃদ্ধ বয়সে যৌন অক্ষমতা জাগে কিংবা যৌনমিলনে বেদনাবোধ হয়, এই ধরনের নানাবিধ যৌনসমস্যার কথা ভেবে বার্ধক্যের যৌন আচরণের মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়।

বৃদ্ধা মহিলাদের যৌনতাবোধ সম্পর্কে যেমন যৌনবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কিশোরী বা তরুণী বয়স থেকে নিয়মিত যৌনমিলন চর্চা থাকলে বৃদ্ধা বয়সেও তার প্রতি আগ্রহ কমে না, তেমনি পুরুষ বৃদ্ধদের ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, নিয়মিত যৌনমিলন চর্চা থাকলে

বৃদ্ধ বয়সেও যৌন ক্ষমতা ও আগ্রহ হ্রাস পায় না, যৌনতৃপ্তিও পরিপূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে। যৌবনকাল থেকে ক্রমাগত যৌনচর্চা করার ফলে যৌনক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে যায় বলে যে ধারণা আছে, যৌনবিজ্ঞানীদের বর্তমান সিদ্ধান্ত সেই ধারণাকেই আজ খণ্ডন করতে চাইছে। বরং যৌনচর্চা বন্ধ করে দেওয়ার ফলেই যৌন কুশলতা বা তথাকথিত যৌন ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে।

ঠিক এই কারণেই অবিবাহিতা (চিরকুমারী) বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্যে যৌনতাবোধ প্রায় থাকেই না; এর একমাত্র কারণ যৌনচর্চার অভাব। এই ধরনের চিরকুমারী বৃদ্ধারা এজন্যই যুবক-যুবতীদের যৌন চাহিদার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না এবং তাঁদের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বংশানুক্রম ব্যবধান (জেনেরেশন গ্যাপ্) লক্ষ্য করা যায়।

উপযুক্ত যৌন সঙ্গীসাথী থাকলে বৃদ্ধ বয়সেও যৌনচর্চা অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এবং রাখা ভাল। বৃদ্ধ বয়সে যাঁরা যৌনচর্চা করেন না, তাঁদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌনসাথীর অভাব দেখা গেছে। স্বাস্থ্যহানির জন্যও যৌনচর্চা বন্ধ করতে হয় বহু ক্ষেত্রে। বাকি যাঁরা বৃদ্ধ বয়সে যৌনচর্চা ছেড়ে দেন, তাঁদের কোন সংরক্ষণশীল সংস্কারমূলক মানসিকতাই সেজন্য দায়ী।

বৃদ্ধা মহিলাদের যৌনতা প্রকাশের একটি বিশেষ সুযোগ আছে এই সমাজে সন্তানাদি লালনপালনের মাধ্যমে। তাঁরা বৃদ্ধপুরুষদের চেয়ে বেশি পরিমাণে ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সুযোগ লাভ করে থাকেন এবং সেই সময়ে ছোটদের আদর যত্নের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে যৌনতৃপ্তি উপলব্ধি করতে পারেন।

বৃদ্ধ বয়সে দাম্পত্য যৌনচর্চার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও ঘটে। একই যৌনসাথীর সঙ্গে একই ধরনের যৌনচর্চা করার পরিণামে তৃপ্তিলাভের পরিমাণ কমে যেতে পারে। ফলে, যৌনমিলনের অনুষ্ঠান কমতে থাকে এবং অনুষ্ঠান কমতে থাকে বলেই আগ্রহ কমতে থাকে। এ থেকে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মনেই সমস্যা সৃষ্টি হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। যেমন, কোনও কোনও দিন যৌনমিলন আসনে যৎপরো-নাস্তি বীতশ্রদ্ধ হলে হয়তো পরবর্তী যৌন অনুষ্ঠানগুলিতেও আর কিছুমাত্র যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি না করতেও পারেন। এটা সম্পূর্ণ মানসিক সমস্যা। তাই দেখে স্ত্রীর মনেও ঠিক সেই মতো বিরূপ প্রতিক্রিয়া জাগতে পারে যে, তিনি নিজেই বুঝি পুরুষটির কাছে সব আকর্ষণ আর ভালবাসা হারিয়েছেন। সহজেই অনুমান করা যায়, বৈচিত্র্যের অভাব-বোধ থেকে উভয়ের মনেই এই ধরনের মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

বৃদ্ধ দম্পতির সংসারে যখন সন্তান-সন্ততি আত্মীয়-পরিজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন ক্রমশই তাঁরা দুজনে আর একান্ত সহবাসের সুযোগ বিশেষ পান না। একান্তভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ নষ্ট হলেও বৃদ্ধ বয়সে যৌনচর্চায় বাধা সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে হতাশা, বিষাদ, বিরক্তি জাগে।

যখন বার্ধক্যের সূচনা হতে থাকে, অধিকাংশ পুরুষ মানুষই সেই বয়সটিতে তাঁর কর্মজীবনে কর্মব্যস্ততার শীর্ষে বিচরণ করতে থাকেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য, অফিস-কাছারী, ক্লাব-সমিতি, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদির মধ্যে তাঁকে সকলেই আকর্ষণ করতে থাকে। তার ফলে তিনি যখন বাড়ি ফেরেন, তখন শরীর ও মন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে থাকে এবং যৌনচর্চায় লিপ্ত হবার মত শারীরিক উদ্দীপনা আর বিশেষ থাকে না।

বৃদ্ধ বয়সে যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরাও বিশেষ-ভাবে উদাসীন বলে মনে হয়। কোনও বৃদ্ধ যদি ডাক্তারকে বলেন, তাঁর যৌনমিলনের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, তাহলে ডাক্তারের কাছে তিনি প্রথমেই হয়তো শুনবেন, ঐরকম তো বৃদ্ধ বয়সে হওয়াই স্বাভাবিক।

অনেক চিকিৎসাবিজ্ঞানী, এমন কি বহু মনোবিজ্ঞানীও উপলব্ধি করতে পারেন না যে, যৌন অক্ষমতার কারণ শুধুমাত্র বার্ধক্যের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি-রস নিঃসরণের হ্রাস ও ভগ্ন-স্বাস্থ্যই নয়, আরও নানাপ্রকার সামাজিক ও মানসিক কারণও তার পেছনে থাকতে পারে।

বৃদ্ধ বয়সে যৌনক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার জন্যে নানাপ্রকার আধুনিক চিকিৎসা অবশ্য প্রচলিত হয়েছে। শারীরিক ব্যায়ামচর্চা করলে যেমন উপকার পাওয়া যায়, তেমনি ইসট্রোজেন ও প্রোজেসটেরোন-এর সাহায্যে চিকিৎসা করালেও মহিলাদের যৌনতৃপ্তি বৃদ্ধি করা যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে টেসটোসটেরোন চিকিৎসার প্রয়োগ করে যৌন উদ্দীপনা বাড়ানো যায়।

অবশ্য, যৌনমিলন সমস্যার প্রধান কারণগুলি অধিকাংশই হল মানসিক এবং সামাজিক। বৃদ্ধ মানুষদের নেতিবাচক যৌন চিন্তা এবং বিশেষজ্ঞদের যথাযথ পরামর্শের অভাব, এই দুই মিলে সমাজে বৃদ্ধদের যৌন আচরণ সম্পর্কে কতকগুলি সামাজিক বিধিনিয়ন্ত্রণ এবং বৈষম্যবোধের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে বৃদ্ধ মানুষদের মুক্ত করতে হলে যৌন আচরণের শুভদায়ক বিষয়গুলির প্রতি তাঁদের উপযুক্ত মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য বৃদ্ধ দম্পতিদের বোঝাতে হবে সমাজ-সংস্কৃতির যে বিধি-নিষেধ তাঁদের যৌনচেতনার ওপর আরোপিত হয়ে আছে, তার সত্যতা কতখানি এবং

তাঁদের নিজ মর্যাদা ও সামর্থ্য এ বিষয়ে কতখানি — যাতে তাঁরা প্রকৃত পরিস্থিতি উপলব্ধি করে নিজেদের যৌন আচরণে সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হন।

যৌন বিশেষজ্ঞদের দৃঢ় ধারণা, দম্পতিদের মধ্যে সুষ্ঠু ভাব-বিনিময় অক্ষুণ্ণ থাকলে এবং তাঁদের দুজনেরই যথাযথ যৌন জ্ঞান থাকলে আজীবন যৌন ক্ষমতা এবং আগ্রহ সজীব না রাখার কোন কারণই ঘটতে পারে না। কেবল প্রয়োজন হতে পারে যৌন আসন প্রক্রিয়ার কিছু বৈচিত্র্য সাধন এবং নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে সুখতৃপ্তির প্রত্যাশা বজায় রাখা।

সুতরাং বার্ধক্য পর্যায়ে যৌন হতাশা এবং ব্যর্থতাজনিত বিষাদ মনোবিকার থেকে বৃদ্ধ সমাজকে অব্যাহতি দিতে হলে এ বিষয়ে গণশিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন সমাজ কল্যাণেরই স্বার্থে। চিকিৎসাবিদ, মনোবিদ, জনসাধারণ এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এ ধরনের শিক্ষামূলক প্রচার প্রবর্তন করা উচিত।

এ কথা সত্য, সমাজে যৌন আচরণ ক্ষেত্রে বৃদ্ধদের প্রতি বৈষম্যবোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের সমাজ মনে করে, যৌনতায় কেবলমাত্র যুবক-যুবতীদেরই অধিকার আছে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নেই। সম্ভবত আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই এই মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। কারণ, সমাজবিজ্ঞানীরা ক্রমশই স্বীকার করছেন যে, বৃদ্ধ ব্যক্তিদের দেহমনের সুষম স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে তাঁদের যৌনতায় গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে।

বৃদ্ধদের যৌন আচরণ সম্পর্কে এই ধরনের পর্যালোচনার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের যৌন আচরণে প্রবৃত্ত হতে প্ররোচিত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, বহু বৃদ্ধ মানুষ অযৌন জীবনযাপনেই সুখী এবং তৃপ্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু যাঁরা বৃদ্ধ হলেও কিছুটা যৌন আচরণের মাধ্যমে শেষ জীবন অতিবাহিত করতে চান, তাঁদের জন্য সমাজ যেন কোনও বিধি নিষেধ বা প্রতিকূল মনোভাব আর না রাখেন।

যদিও বৃদ্ধদের জন্য এরকম যৌন স্বাধীনতা সমাজে অনুমোদিত হয়ে যায়, তাহলেও একটি সমস্যা থেকে যাবে, তা হ'ল এই যে, যৌনযোগ্যতাসম্পন্ন বৃদ্ধ পুরুষের চেয়ে ঐ শ্রেণীর বৃদ্ধা মহিলার সংখ্যা থেকে যাবে সর্বদাই অনেক বেশি, যাঁরা পুরুষ-সঙ্গীবিহীন। তার প্রতিবিধানে সুস্থ পরিতৃপ্ত সমাজের কল্যাণে বৃদ্ধদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার কথা উঠতেও পারে। তাতে বৃদ্ধদের নিঃসঙ্গ জীবনধারা সুখময় হতে পারে, সমবেতভাবে বসবাসের ফলে ব্যয়বাহুল্য হ্রাস পেতে পারে, এরকম যুগান্তকারী বৈপ্লবিক চিন্তাধারাও অনেকে পোষণ করেন।

॥ অধ্যায় ৭ ॥
মৃত্যুচিন্তা

মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সব মানুষেরই জীবনে আসে। বৃদ্ধ বয়সে এই অভিজ্ঞতার পদধ্বনি যৌবনের চেয়ে বেশি অর্থবহ মনে হতে থাকে। কোন বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু হলে বৃদ্ধ মানুষ তাঁর নিজের বার্ধক্যের শোচনীয় পরিণতির কথাও ভাবতে শুরু করেন।

প্রাচীনকালে মৃত্যুকে সর্বদাই জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি বলে মানুষ স্বীকার করে নিতে পারত। সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যু কোন রহস্য বলেই বোধ হত না। অসংখ্য শিশুমৃত্যু, মড়ক মহামারী, দুর্ঘটনা, রোগব্যাধি, হত্যা, বধ প্রভৃতি এতই অহরহ ঘটত যাতে মানুষ মৃত্যুর অব্যাহত আবির্ভাব যেন যে কোন মুহূর্তেই দেখবার মানসিকতা গড়ে তুলেছিল।

এ যুগের সমাজে মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব বিজ্ঞানের কল্যাণে অবশ্যই অনেক কমে গেছে। রোগযন্ত্রণায় মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যু আজকাল সবার চোখের সামনে বড় একটা হয় না। কারণ কঠিন রোগাক্রান্ত মরণাপন্ন ব্যক্তিদের শেষ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালেই নিয়ে যাওয়া হয়।

তবুও সাধারণত লোকের ধারণা, বৃদ্ধ হলে মৃত্যুচিন্তা মানুষকে আতঙ্কিত করে। এই মরণাতঙ্ক (থ্যানাটোফোবিয়া) বৃদ্ধ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সাম্প্রতিক নিরীক্ষায় দেখা গেছে, এই ধারণা ঠিক নয়। বয়স যত বাড়তে থাকে, বাস্তবক্ষেত্রে মরণাতঙ্ক তত কমতেই থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যতই বার্ধক্যের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি এগুতে থাকেন, ততই তাকে প্রশান্তচিত্তে স্বীকার করে নিতে থাকেন। বরং তরুণ বয়সে যাঁরা রোগাক্রান্ত হয়ে মরণাতঙ্কের মানসিকতা লাভ করেন, তাঁদের মধ্যেই এ বিষয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার নানাবিধ লক্ষণ দেখা যায়।

বৃদ্ধ বয়সে মরণাতঙ্ক ক্রমশই কমে যাওয়ার একটি কারণ হল, বার্ধক্য ধীরে ধীরে মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলিতে ম্লান থেকে ম্লানতর করে দিতে থাকে। তখন মানুষ বুঝতে পারে, এ জগতে তার অনেকদিনই থাকা হল, এবার চলে

যাওয়াই ভাল। চোখের সামনে কানের কাছে সমকালীন বন্ধু, আপনজনদের মৃত্যু সংবাদ এসে তাকে এইভাবেই আসন্ন মৃত্যুকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টিতে যেন সহায়তা করতেই থাকে। জীবন-ধারণ করে থাকার কোন অর্থই আর তার কাছে থাকে না। সুতরাং পরিণত বার্ধক্যে মানুষ মরণাতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে মৃত্যুকে আবাহন করতেই থাকে।

কিন্তু তাহলেও বৃদ্ধ মানুষ যখন চিকিৎসকের পরামর্শের প্রয়োজন বোধ করেন, তখন তাঁকে সুস্থ জীবন যাপনে সঠিক পরামর্শই দেওয়া দরকার। দুঃখের বিষয়, মরণাপন্ন বৃদ্ধ ব্যক্তিদের চিকিৎসা সম্পর্কে অধিকাংশ চিকিৎসক এই ধরনের মনোভাব পোষণ করেন না; তাঁদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, একজন যুবকের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে, সুতরাং তার জীবনরক্ষার জন্য যতটা মনোযোগ ব্যয় করা যায়, ততটা মনোযোগ মৃতপ্রায় কোনও বৃদ্ধদের চিকিৎসায় না দিলেও চলে। কেবল চিকিৎসক নয়, বৃদ্ধ রোগীর অনেক আপনজনও এরকম ভেবে থাকেন।

বলা চলে, সমাজে এমন একটা মনোভাবের ফলে জীবনের সায়াহ্নে বৃদ্ধ মানুষের 'সামাজিক মৃত্যু' ঘটেই থাকে!

মৃত্যু সমাসন্ন বুঝতে পারলে বৃদ্ধ মানুষের মনে যেসব প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, প্রথম পর্যায়ে মৃত্যুচিন্তার বিষণ্ণতাবোধে বৃদ্ধ মানুষ নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে সমাজের প্রতি ক্রোধ-বিরক্তির ভাব পোষণ করতে শুরু করেন। এই পর্যায়ে তাঁর মনে হতে থাকে, জীবনযাত্রায় সমাজ তাঁকে বঞ্চিত করে এসেছে নানাভাবে এবং এখনও বঞ্চিত করতে চাইছে। এই পর্যায়ে বৃদ্ধ মানুষের প্রতি সমাজের সকলেরই সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া উচিত, কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, তা কেউ হতে পারে না।

বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং ক্রোধ-বিরক্তি পর্যায় দুটি অতিক্রম করে অনেক ক্ষেত্রে মরণোন্মুখ বৃদ্ধ রোগী ডাক্তার, আপনজন, এমনকি ভগবানের কাছেও নানাভাবে অনুনয়-বিনয় করে আর কিছুদিন তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে বলেন। তারপরে আসে গভীর বিষাদ-বোধ এবং সবশেষে অবশ্যম্ভাবী সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েন। আর কোনও কথা বলতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তাহলেও এ সময়ে বৃদ্ধ রোগীর শয্যার পাশে আপনজনের সদা-সর্বদা উপস্থিতি এবং সাক্ষাৎকার রোগীর শেষ মুহূর্তগুলিতে অনেক ভরসা দিতে পারে।

বার্ধক্যই মানুষের মৃত্যু ডেকে আনে না। মৃত্যু ঘটে একাধিক অসুস্থতা, ব্যাধি বা দৈহিক বিকলতার পরিণাম স্বরূপ। হৃদ্‌রোগ, ক্যানসার, সন্ন্যাস প্রভৃতি কারণেই বৃদ্ধেরা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্রুত মৃত্যুবরণ করেন। দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, বৃক্ক ও যকৃতের দোষ প্রভৃতি কারণেও বৃদ্ধদের মৃত্যু কম হয় না। বৃদ্ধাদের মৃত্যুহার বেশি হয় ডায়েবেটিস এবং ধমনীকাঠিন্য রোগ থেকে। অবশ্য সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধাদের মৃত্যুহার বৃদ্ধদের চেয়ে কমই হয়। এ যুগে বৃদ্ধ বয়সে যেভাবেই মৃত্যু হোক না কেন, তার অধিকাংশেরই মূল কারণ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত আছে বলে বার্ধক্যবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন। এই সিদ্ধান্তের অর্থ এই যে, বার্ধক্য এবং জরাগ্রস্ত মানুষের মৃত্যু হয় শুধুই শারীরবৃত্তীয় অবনতির জন্য নয় — অনেকাংশে সমাজ ব্যবস্থার কতকগুলি সমকালীন বৈশিষ্ট্যের জন্যই।

যেমন ধরা যাক, আত্মহত্যার মাধ্যমে বৃদ্ধদের মৃত্যুর হার এযুগে সর্বদেশেই যেন বৃদ্ধির পথে। বৃদ্ধদের দুর্ঘটনাজনিত বহু মৃত্যু অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আত্মহত্যারই পরিণাম। সমাজে প্রায়ই বৃদ্ধরা অবাঞ্ছিত বলে অবহেলিত হয়ে থাকেন, সেজন্য তাঁরা আত্মহত্যার প্রচেষ্টায় মৃত্যু ত্বরান্বিত করতে চাইলে অনেকেই তাকে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলে ধরে নিতে দ্বিধা করেন না। কুখাদ্য আহার, অত্যধিক ধূমপান, বিছানা বা চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়া — বার্ধক্যের এসব আচরণ থেকে বুঝে নিতে হবে, আচরণকারী বৃদ্ধ নিজেকে ধ্বংস করতেই চাইছেন — তিনি আর সমাজের এই সযত্ন বন্দীজীবন যাপন করতে চাইছেন না।

বৃদ্ধ বয়সে আত্মহত্যা কেবল যে দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়েই ঘটে, তা নয়; বহু ক্ষেত্রে বৃদ্ধ মানুষ অর্ধাহার, অনিদ্রা প্রভৃতি উপায়ে দেহমনের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি স্বেচ্ছায় অবিরত অবহেলা অযত্ন করতে করতে ক্রমেই আত্মহননের পথে নিজেকে ঠেলে দিতে থাকেন।

বৃদ্ধা বিধবাদের চেয়ে বিপত্নীক বৃদ্ধদের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এ থেকে মনে হয়, বিপত্নীক বৃদ্ধদের নিঃসঙ্গতার বিষণ্ণতাবোধ নিশ্চয়ই স্বামীহারা বৃদ্ধা বিধবাদের চেয়ে গভীরতর দুঃখজনক এবং তীব্রতর বেদনাদায়ক। কারণ সম্ভবত, পত্নীবিয়োগের ফলে বৃদ্ধ পুরুষ মানুষের জীবনধারায় আকস্মিকভাবে যে ধরনের নানা-প্রকার পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়, তার মধ্যে বিপত্নীক বৃদ্ধমাত্রই খুব ভেঙে পড়েন এবং পরিবর্তনগুলি তাঁর ওপর অভাবনীয় চাপ সৃষ্টি করে যার ফলে দ্রুত স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

পত্নীবিয়োগজনিত আকস্মিক পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে বিপত্নীক বৃদ্ধ মানুষের কষ্ট হয় কিভাবে, তা উপলব্ধি করতে হলে চিন্তা করা দরকার — বিবাহিত পুরুষের জীবনধারায় স্ত্রীর ভূমিকা কতখানি ব্যাপক এবং একাধিক সামাজিক রীতিনীতির ফলে স্ত্রীর ওপর নানাভাবে পুরুষ কতখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পত্নীবিয়োগ হলে বৃদ্ধ বয়সে মানুষকে সেই নির্ভরশীলতা থেকে গার্হস্থ্য বিষয়ে আত্মনির্ভরশীলতার কঠিন

পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় — যে ধরনের আত্মনির্ভরশীলতার চর্চা থেকে বিবাহিত পুরুষকে তাঁর স্ত্রী যেন বঞ্চিত করে রাখতেই চান। এটাও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিণতি, সে কথা স্মরণে রাখা দরকার।

এ ছাড়া, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের যে কাজটি মহিলারাই সাধারণত করে থাকেন, বিপত্নীক পুরুষ সেকাজে তত দক্ষতা অর্জন করতে পারেন না, কারণ পত্নীবিয়োগের পরে বৃদ্ধ মানুষ সকলের সঙ্গে মেলামেশা খুবই কমিয়ে ফেলেন এবং একান্তে নিঃসঙ্গ জীবনযাপনে বেশি আগ্রহবোধ করতে থাকেন।

এই ধরনের নিঃসঙ্গতা এবং বিষাদময় জীবনধারার জন্যই বিপত্নীক বৃদ্ধদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা যেন স্বামীহারা বৃদ্ধা বিধবাদের চেয়ে বেশি মনে হয়।

আর একটি ঘটনা সংযোগ প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে, কোনও বৃদ্ধ মানুষ বিপত্নীক যখন হন, তখন প্রায় একই সময়ে কর্মজীবন থেকেও অবসর পান অথবা নানাকারণে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে থাকে। এসব কারণে বৃদ্ধরা বিপত্নীক হলে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

স্বামীবিয়োগও বৃদ্ধা মহিলাদের মনে খুবই আঘাত হানে, সত্য কথা। তবে বার্ধক্য-বিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করেন, নারীজীবনে বিবাহিতা স্ত্রীর ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি একথাও অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ মহিলাই স্বামীর সহায়তা ছাড়াই নানাপ্রকার অপরিহার্য সামাজিক কর্মসূচীতে সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বনির্ভর আস্থা নিয়ে আত্মনিয়োগ করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন। এই সাবলীল স্বনির্ভরতা এবং আস্থাবোধের ফলে বিধবা বৃদ্ধা অচিরে সমাজের নানাবিধ অপরিহার্য কর্মসূচীতে অর্থবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সুস্থ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারা গড়ে নেবার সুযোগ পেয়ে যান।

॥ অধ্যায় ৮ ॥

মনোবিজ্ঞান

মানুষের মনের বিকাশ কেমন করে হয়, তা নিয়ে মনোবৈজ্ঞানিক চর্চা নানাভাবেই করা হয়ে থাকে। শিশুর ও যুবসমাজের মনোবিকাশ নিয়ে প্রচুর গবেষণা-নিরীক্ষা এবং আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বার্ধক্যের মনোবিকাশ কেমন করে হয়, কি তার সমস্যা, বৈশিষ্ট্য, তা নিয়ে যথেষ্ট ব্যাপকভাবে চিন্তা চর্চা করা হয়নি। ইদানীং পৃথিবীর নানা-দেশে বার্ধক্যের বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসার লাভ করছে।

বার্ধক্যের পর্যায়ে মানুষের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেগুলি নিতান্ত তুচ্ছ নয়। ঐ সকল সমস্যা অবহেলিত হবার ফলে সমাজে মানুষ অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে।

বর্তমান যুগে মানুষ বেশিদিন বাঁচতে পারছে বিজ্ঞানের নানাপ্রকার আশীর্বাদের ফলে। এখন বৃদ্ধ বয়সেও মানুষ বেশ কিছুদিন সমাজে অস্তিত্ব রেখে চলতে পারছে। সুতরাং পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে বৃদ্ধ মানুষের সামঞ্জস্যবিধানের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাও বেড়ে চলেছে।

মানুষের জীবনে বার্ধক্যের পর্যায়টি সম্পর্কে নানাপ্রকার ভুল ধারণা আছে। বৃদ্ধ হলে সমাজে মানুষের মর্যাদার পরিবর্তন হয়। অনেকে বৃদ্ধ মানুষকে শ্রদ্ধা করে, আবার অনেক লোক বৃদ্ধদের অবহেলা করে; নিজের সন্তানের কাছেও বৃদ্ধ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে মর্যাদা হারায়। সমাজের কিছু কিছু গুরুদায়িত্বপূর্ণ ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ থেকে বৃদ্ধদের যুবকরা পৃথক করে রাখে।

বৃদ্ধা মহিলাদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক মর্যাদা আরও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পুরুষপ্রধান সমাজে বৃদ্ধা মহিলার প্রতি সকল সময়ে যথাযথ মনোভাব পোষণ করা হয় না। বার্ধক্যবিজ্ঞানের তথ্যাদি এবিষয়ে মানুষকে সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলতে চায়।

বৃদ্ধ বয়সে মানুষের মানসিক আচরণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণত যে সব ধারণা

প্রচলিত, সেগুলির কয়েকটি নিচে তালিকাবদ্ধ করা হল ; এগুলির সত্যতা সম্পর্কে বার্ধক্য-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক প্রশ্ন তুলে ধরা যায়। ধারণাগুলি হল :—

১। বয়স বাড়লে বুদ্ধি কমে।

২। বয়স বৃদ্ধি পেলে আত্মমর্যাদা বোধ কমে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুসুলভ মানসিকতার পুনরুদ্রেক ঘটে।

৩। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিখন (learning) ক্ষমতা কমতে থাকে।

৪। অধিকাংশ বৃদ্ধ মানুষ মানসিক অসুস্থতায় কষ্ট পান।

৫। বয়স্থ মানুষ সংরক্ষণশীল হয়ে পড়তে থাকেন।···ইত্যাদি।

বার্ধক্যের মনস্তত্ত্ব নিয়ে সম্প্রতি যেসব গবেষণা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ হয়েছে, তা থেকে উপরিউক্ত ধারণাগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এগুলি আর এখন পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়।

মনোবিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে বৃদ্ধ মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করার সময়ে এই সকল মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সহানুভূতি সহকারে আলোচনা চলছে। এগুলি নিয়ে বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান (ডেভেলপমেনট্যাল সায়কোলজি)-এর কর্মীরা বিশেষভাবে তথ্যানুসন্ধান করছেন। বয়স বৃদ্ধির কোন্ পর্যায়ে মনের গতিবিধি কেমন হয় — এবং সেই সব গতি-বিধির শারীরবৃত্তিক, সামাজিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করে চলেছে বার্ধক্য মনোবিজ্ঞানের এই শাখাটি।

এই সব বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি হল তুলনামূলক ; অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তরুণ বয়সের ক্রিয়াকলাপের তুলনা করা হয়। শারীরচালনা, প্রতিক্রিয়ার সময়, সতর্কতা, বুদ্ধি প্রয়োগ, কোন কিছু শেখা, মনে রাখা, সৃষ্টি করা, ব্যক্তিত্ব প্রকাশ, তৃপ্তি-বোধ, মনোবিকার ইত্যাদি প্রক্রিয়ার লক্ষণগুলির তুলনামূলক নিরীক্ষা করে বার্ধক্য মনোবিজ্ঞান বৃদ্ধদের মানসিক সত্তার স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

শারীরচালনা বলতে আমরা বুঝি মানুষের দেহের পেশীগুলিকে শিখনপ্রাপ্ত কৌশলে স্বেচ্ছামত চালনা করে কোন কাজ করা। পেশী সঞ্চালনের ফলে শারীরচালনার পেছনে থাকে তিনটি প্রক্রিয়া। প্রথমটি হল উপলব্ধি – এর ফলে মানুষ পরিবেশের উদ্দীপকের দিকে মনোযোগী হয়। দ্বিতীয় স্তরে আসে তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া, যখন মানুষ পরিবেশের উদ্দীপকের দিকে কিভাবে সাড়া দেবে, নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে তা ঠিক করে। তৃতীয় স্তরে হয় প্রতিক্রিয়া — এখানেই সাধারণত হয় শারীরচালনা।

শারীরচালনা দু'ধরনের হতে পারে। এক হল, সহজ সরল পেশী সঞ্চালন। এর জন্য মানুষকে বিশেষ তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয় না। কিন্তু জটিল ধরনের পেশী সঞ্চালনের কাজ

হল সাইকেল চড়া, লেখাজোখা, নাচগান ইত্যাদি। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এই দু'ধরনেরই শারীরচালনার দক্ষতা কমতে থাকে।

এমন কতকগুলি কাজ আছে, যাতে শারীরচালনার সঙ্গে বিশেষভাবে দক্ষতা সহকারে মনঃসঞ্চার করতেও হয়। এই ধরনের মনঃসঞ্চারী শারীরবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপ (সায়কো-মোটর পারফরম্যান্স্) প্রতিদিনই মানুষকে করতে হয়, যেমন—

১। গমন (হাঁটাচলা, ওঠানামা ইত্যাদি),
২। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চা) খাওয়া, স্নান করা, পোশাক পরা, ইত্যাদি),
৩। গৃহস্থালী (ঝাড়ামোছা, জিনিসপত্র গোছানো, কাচাকুচি, রান্নাবান্না, কেনাকাটা, ইত্যাদি),
৪। অবসর বিনোদন (খেয়াল খেলা ইত্যাদি)।

মানুষের জীবনধারায় যখন এই সব কাজ করার অক্ষমতা জাগতে থাকে, তখন জীবনের স্বাধীনতাবোধ বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই ধরনের হীনতাবোধ থেকেই বৃদ্ধ বয়সে দুর্ঘটনা ঘটে বেশি।

বৃদ্ধ বয়সে মনঃসঞ্চারী শারীরবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপগুলির দক্ষতা কমে যাওয়ার একটি কারণ হল পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়ার সময়দৈর্ঘ্য (রিঅ্যাকশন টাইম) বৃদ্ধি পায়। যেমন, কোনও শব্দ শুনলে সেদিকে তাকাতে হবে — এই যে তাকানোর কাজটা, এই প্রতিক্রিয়াটা হতে বৃদ্ধ বয়সে একটু বেশি সময় লাগে, একথা সবাই জানেন।

মনোবিজ্ঞানের নিরীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯ থেকে ২৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিক্রিয়ার সময় মোটামুটি একই থাকে। ২৬ বছর বয়সের পর থেকে এই দক্ষতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ক্রিয়াকলাপ যত জটিল হবে, প্রতিক্রিয়ার সময় ততই বাড়তে থাকে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। ৬৫ বছর বয়সে পরিণত বার্ধক্যে প্রতিক্রিয়ার সময়দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হয়।

সাম্প্রতিক একটি নিরীক্ষায় আরও দেখা গেছে তরুণদের মধ্যে যারা কোনরকম ক্রীড়াচর্চা করে না, তাদের প্রতিক্রিয়ার বা সঞ্চলনের সময় (রিঅ্যাকশন বা মুভমেণ্ট টাইম ; RT বা MT) অনেকটা বৃদ্ধের মতই দুর্বল। এই নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শারীরিক ব্যায়ামচর্চা করলে হৃদ- ও রক্তসংবহন প্রণালীর কর্মদক্ষতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং দেহের স্নায়ুকোষগুলির অকর্মণ্যতা প্রতিরোধ করে।

অতএব বৃদ্ধরা যদি কতকগুলি আকস্মিক সামাজিক পরিস্থিতির কাল্পনিক তালিম

দেওয়ারও অভ্যাস করেন, তাহলে শরীর ও মনের সচেতনতা অক্ষুন্ন থাকতে পারে এবং আকস্মিক পরিস্থিতিতে যথাসময়ে যথাযথ প্রতিক্রিয়া জাগাতে পারে।

সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে অবসরপ্রাপ্ত জীবনের নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম গ্রহণের ব্যবস্থাটাই সব কথা নয় — সুখী বৃদ্ধ জীবন যাপন করতে হলে কায়িক এবং মানসিক অনুশীলনের ধারা যথাসাধ্য সমানে রেখে চলতে হবে। যেমন ধরা যাক, বাড়িতে আগুন লাগার মত বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথা যদি মনে মনে চিন্তা করা যায় এবং তা নিয়ে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা করা যায়, তাহলে ঐরকম পরিস্থিতিতে কি করা যেতে পারে, তার মানসিক সচেতনতা অনেকখানি গড়ে উঠতে থাকে এবং কার্যক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া হয় দ্রুত।

যদিও ২০ বছরের যুবক এবং ৬৫ বছরের বৃদ্ধের প্রতিক্রিয়া সময় (RT)-এর পার্থক্য মাত্র ১০ শতাংশ, তাহলেও মানসিক সচেতনতার ঐ সামান্য পার্থক্যের জন্যই পথ দুর্ঘটনা প্রভৃতির মত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে অনেক সময় শোচনীয় পরিণাম ঘটতে পারে।

বার্ধক্যের সঙ্গে সতর্কতামূলক মনোভাবের কতখানি সম্পর্ক আছে, তা নিয়ে নিরীক্ষা হয়েছে এবং তাতে জানা গেছে যে, কোনও বিষয়ে সাড়া দিতে দেরি করা বা সাড়া না দেওয়ার মধ্যে যে দ্বিধাগ্রস্ত সতর্কতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তা কিন্তু তরুণদের চেয়ে বৃদ্ধদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। বৃদ্ধ বয়সে যে সংরক্ষণশীলতা মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং নিজের ভাবমূর্তি সম্পর্কে যে অনাস্থা জাগে, তার ফলেই আসে এই দ্বিধা ও সতর্কতা। বৃদ্ধ মানুষ এমন কিছু করতে চান না, যাতে সমাজে তাঁর ভাবমূর্তি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এজন্যই তাঁদের সব কাজে দ্বিধাজড়িত সদাসতর্ক ভাবটি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য বাধ্য হয়ে যেসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বৃদ্ধ মানুষকে করতেই হয়, সেখানে দেখা গেছে, তরুণদের মতই বৃদ্ধরা দ্বিধাহীনতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়ে অগ্রণী হয়ে থাকেন। কিন্তু এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির পরিণামে বৃদ্ধ মানুষের স্নায়বিক উত্তেজনা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে, অবসাদ বোধ করেন।

এজন্যই মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরপত্রাদির মাধ্যমে বৃদ্ধদের যা কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়, তাতে দেখা যায়, অধিকাংশ বৃদ্ধ 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই না বলে মাঝামাঝি জবাব দিয়ে ছেড়ে দেন।

মানুষের আচার-আচরণের পেছনে অনেকগুলি অঙ্গ-অবয়ব কাজ করতে থাকে। এগুলি সক্রিয় হবার আগে দুটি জিনিস ঘটে — প্রথমে হয় ইন্দ্রিয়াদি মাধ্যমে কোনও উদ্দীপকের অনুভূতি গ্রহণ, এবং তারপরে প্রকৃত আচরণ-ব্যবহার।

এই দুটি প্রক্রিয়ার মাঝখানে কিন্তু একটা জটিল মানসিক কর্মপ্রক্রিয়া বিদ্যুৎগতিতে

ঘটে যায়। সেই মানসিক কর্মপ্রক্রিয়াটির মাধ্যমেই তথ্য বিশ্লেষণ হয় বিভিন্ন অঙ্গ-অবয়বের স্নায়ুবাহিত চেতনার সাহায্যে। এই ধরনের বিদ্যুৎগতি মানসিক কর্ম প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র রচিত হয় যেসব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে, সেগুলি হল — বুদ্ধি (intelligence), শিখন (learning), স্মৃতি (memory), সৃজনী শক্তি (creativity) এবং ব্যক্তিত্ব (personality)। বৃদ্ধ বয়সের মনস্তত্ত্বে এই বৈশিষ্ট্যগুলির ভূমিকা পর্যালোচনা করলে বৃদ্ধদের প্রতি সহানুভূতিমূলক মনোভাব সকলেরই সৃষ্টি হতে পারে।

বুদ্ধি সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানে যত বেশি চর্চা হয়েছে, তেমন বোধহয় অন্য কোনও বিষয়ে হয়নি। তবু এখনো বেশ মতভেদ আছে বুদ্ধির সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে, এবং বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষাগুলি প্রকৃতপক্ষে কিসের পরিমাপ করে, সে সম্পর্কেও। বুদ্ধি কাকে বলে, তাই নিয়ে এখনও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে নানারকম পরস্পরবিরোধী কথা শোনা যায়।

সচরাচর মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, বয়স বাড়তে থাকলে বুদ্ধির কোন কোন দিক দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। বুদ্ধিমাপনীতে বৃদ্ধরা কাজের ব্যাপারে কম সাফল্যাঙ্ক (স্কোর) পান, কিন্তু বুদ্ধিমাপনীর মধ্যে যেসব বিষয়ে ভাষাগত দক্ষতা পরিমাপের প্রাধান্য আছে, সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু বৃদ্ধরা তরুণদের মতই যথেষ্ট সাফল্যাঙ্ক অর্জন করতে পারেন।

ইদানীং অবশ্য গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য ঐ ধারণা আর সমর্থন করছে না। এখন মনোবিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করেছেন, বয়স বাড়লেই বুদ্ধি কমে যায়, একথা মোটেই অবশ্যম্ভাবী নয়। বয়স বাড়লে যা প্রকৃতপক্ষে ঘটতে পারে, তা হল হৃৎপিণ্ড ও দেহের রক্ত প্রণালীর কর্মক্ষমতা হ্রাস, অথবা ধমনীকাঠিন্যজনিত দুর্বলতার ফলে মস্তিষ্কের দিকে রক্ত সংবহনের স্বল্পতার দরুন তথাকথিত বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষীণ অভিব্যক্তি।

মস্তিষ্কের দিকে রক্তসংবহনের এরকম ক্ষীণতার জন্যই বৃদ্ধ বয়সে ঘুমের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। শারীরিক সাধারণ জরাজনিত দুর্বলতার জন্যও বৃদ্ধ বয়সে অনেকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়া ঠিকমত কর্মক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে না। তা থেকে সাধারণ মানুষ মনে করে, বৃদ্ধ হওয়ার ফলে বুদ্ধি কমে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, যেটা কমতে থাকে, সেটা বুদ্ধি কিনা, কেউ ঠিক করে বলতে পারেন না।

তরুণদের বুদ্ধি প্রকাশের সঙ্গেই সাধারণত বৃদ্ধদের তুলনা করে বুদ্ধির হ্রাস-পরিমাপ করা হয়ে থাকে মনোবিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষেত্রে। কিন্তু তরুণদের ভাল স্বাস্থ্য, উন্নত শিক্ষা, এবং বিভিন্ন উদ্দীপনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে বৃদ্ধদের বুদ্ধিবৃত্তির তুলনামূলক অসম নিরীক্ষা করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্তই

অসমীচীন। বৃদ্ধদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং উদ্দীপনার মান যখন তরুণদের মত নয়, তখন তরুণদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করে বুদ্ধির হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাপ করা চলে না বলেই মনে হয়।

কেবলমাত্র বৃদ্ধদের মধ্যেই তুলনামূলক নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, পরিবেশের উদ্দীপনা যাঁদের জীবনধারায় বেশি থাকে, তাঁরা বৃদ্ধ বয়সেও চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত থাকতে পারেন। পরিবেশের উদ্দীপনা বলতে চলাফেরার স্বাধীনতা, সুস্বাস্থ্য, আর্থিক স্বচ্ছলতা সকলের শ্রদ্ধাসমীহ, ইত্যাদির অস্তিত্বের মাধ্যমে প্রেরণা লাভ করা।

তাছাড়া, যে বুদ্ধিমাপনী দিয়ে তরুণদের বুদ্ধি পরিমাপ করা হয়, তা দিয়ে বৃদ্ধদের বুদ্ধি পরিমাপ করতে গেলে অনেকে আপত্তি করে থাকেন যে, বুদ্ধিমাপনীর বিষয়বস্তু ও ভাষা বৃদ্ধদের মনের উপযুক্ত নয়। অল্পবয়সীদের উপযোগী ভাষা দিয়ে যে বুদ্ধিমাপনী রচিত হয়ে থাকে, তা বৃদ্ধদের মনোমত না হওয়াই স্বাভাবিক।

এই কথা মনে করে কিছু মনোবিজ্ঞানী বৃদ্ধদের জন্য এমন ভাষা দিয়ে বুদ্ধিমাপনী করেছিলেন, যাতে বৃদ্ধ বয়সের চাহিদা অনুসারে ভাষা ও বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়। দেখা গেছে, ঐ ধরনের বিশেষ বুদ্ধিমাপনীতে বৃদ্ধরা বেশি সাফল্যাঙ্ক অর্জন করতে পেরেছেন।

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে একথাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিরীক্ষামূলক পরিবেশে বৃদ্ধদের বয়স্ক শিক্ষার মত অবিরাম ক্রমান্বয়ী শিক্ষাচর্চা করাতে থাকলে বুদ্ধি-মাপনীতে তাঁদের অর্জিত সাফল্যাঙ্ক বেশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা বলতেই বুদ্ধি হয়ত বোঝায় না — কিন্তু পরিবেশের বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে যথাযথভাবে ক্রমান্বয়ী শিক্ষাচর্চা অব্যাহত রাখতে পারলে বুদ্ধিমাপনীতে অর্জিত সাফল্যাঙ্কের মাধ্যমে তার প্রতিফলন প্রকটিত হবেই এবং তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেবল বার্ধক্যের জন্যেই বৃদ্ধদের বুদ্ধি কমে যায়, তা বললে ভুল বলা হবে।

অবশ্য মনোবিজ্ঞানীরা এখনো সঠিকভাবে বলতে পারেননি — শিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধি বেশি হয়, না কি, বুদ্ধি বেশি থাকলে শিক্ষা অর্জন বেশি করা যায়। তবে, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, স্কুলে কলেজে যাঁরা শিক্ষা অর্জন করে থাকেন, তাঁদের বুদ্ধিবিকাশের ব্যাপকতা অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মানুষদের চেয়ে বেশিই হয়।

শিখন মাধ্যমে বৃদ্ধ বয়সেও মানুষের মানসিক প্রক্রিয়াকে অনেকাংশে সজীব রাখা যায়, একথা নিরীক্ষায় সমর্থিত হয়েছে। তবে অল্পবয়সে শিখন প্রক্রিয়া যেভাবে কাজ করে, বার্ধক্যে তেমনভাবে করে না। সেজন্য বৃদ্ধ বয়সে শিখন মাধ্যমে মানসিক প্রক্রিয়াকে উজ্জীবিত রাখতে হলে স্মরণে রাখতে হবে যে, বৃদ্ধ শিক্ষার্থীর সামনে শিখনীয় বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা উচিত ধীর পর্যায়ক্রমে। অকস্মাৎ প্রশ্ন করে তৎক্ষণাৎ জবাব চাইলে

বৃদ্ধ বয়সের শিক্ষার্থীর পক্ষে সঠিকভাবে সাড়া দেওয়া সহজসাধ্য নয়। যাঁরা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে বৃদ্ধ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান কাজে রত আছেন, তাঁদের কাছে এই বিষয়টি নিশ্চয়ই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বৃদ্ধ বয়সে শিখন প্রক্রিয়ার আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ঐ বয়সে যা কিছুই শেখান হোক তা যেন পরিচিত বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে সহজ অর্থবহ হয়, এবং অতি ভাবমূলক (অ্যাব্ সট্র্যাক্ট্) বিষয়বস্তু না হয়। অর্থাৎ প্রাক্-স্কুল পর্যায়ে শিশুদের যেভাবে শেখান হয়, সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হয় বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে বৃদ্ধ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও।

বৃদ্ধদের কোন কিছু শেখাতে হলে কেবলমাত্র শোনালে বা কেবল দেখালে সুফল পাওয়া যায় না — একই সঙ্গে দুটি ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করে শেখাতে হয়। বই দেখে বৃদ্ধ-শিক্ষার্থী যখন কিছু পড়বেন, তখন শিক্ষকও জোরে জোরে সেটি পড়ে শোনাতে থাকবেন। এভাবে চোখ এবং কান দুটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিখনীয় বিষয়বস্তু বৃদ্ধ শিক্ষার্থীদের কাছে সার্থকভাবে উপস্থাপন করা দরকার।

স্মৃতি এবং শিখন পরস্পর-সম্পর্কিত মানসিক বৈশিষ্ট্য। দুর্বল স্মৃতিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে কোন কিছু শিখতে স্বভাবতই দেরি হয়। শেখা এবং মনে রাখা, এই দুটি ব্যাপার অবশ্যই এক নয় — কিন্তু দুটির পেছনেই একই ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করতে থাকে। শেখা মানে জ্ঞান অর্জন করা আর মনে রাখা মানে সেই অর্জিত জ্ঞানকে ধারণ ও প্রয়োগ করার ক্ষমতা।

অনেকে বলেন, বয়স বাড়লে স্মৃতিহ্রাস ঘটে। কিন্তু অনেক অতিবৃদ্ধ মানুষ বহু অতীতের কাহিনী অনর্গল বলে যেতে পারেন, দেখা গেছে। এই দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিশক্তি (long-term memory) সম্পর্কে গবেষকরা বলেন, কোন বিষয় নিয়ে সারা জীবন বারে বারে অভ্যাস চর্চা করতে থাকার ফলেই বয়স বাড়লেও সে বিষয়ে স্মৃতিহ্রাস ঘটে না। অর্জিত কোনও জ্ঞানসম্পদ মনের মধ্যে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকলেই তার স্মৃতি-বিলোপ ঘটতে থাকে।

মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে বৃদ্ধদের ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিশক্তি (short-term memory) সম্পর্কে নিরীক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন, স্মৃতিমাপনী প্রয়োগ করার আগে বৃদ্ধ শিক্ষার্থীদের শ্বাসপ্রক্রিয়াকে উজ্জীবিত করার জন্য সামান্য পরিমাণে অকসিজেন প্রয়োগ করলে স্মৃতি উদ্ধার কাজে বৃদ্ধরা অধিকতর সাফল্য লাভ করতে পারেন। এই নিরীক্ষার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, মস্তিষ্কে অকসিজেন সরবরাহ যথেষ্ট থাকলে স্মৃতিধারণের প্রক্রিয়া ভালভাবে কাজ করতে পারে। বৃদ্ধদের শিখন প্রক্রিয়ার কাজে যাঁরা ব্রতী

থাকেন, তাঁদের কাছে এই তথ্য নিশ্চয়ই সহায়ক প্রতিপন্ন হবে। বাস্তবক্ষেত্রে এজন্যই যেখানে বাতাসে অকসিজেনের স্বচ্ছলতা আছে, এরকম খোলামেলা জায়গাতেই বৃদ্ধ মানুষদের নিয়ে শিক্ষাচর্চার আয়োজন করা উচিত।

সৃজনীশক্তি বৃদ্ধ বয়সে কেমন থাকে, তা নিয়েও মনোবিজ্ঞানীরা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সৃজন বলতে শিল্পকাজের ক্ষমতাই শুধু বোঝায় না, কোন কাজের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন কিংবা প্রাত্যহিক জীবনধারার মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উপস্থিত বুদ্ধিবলে উপযুক্ত আচরণ সামঞ্জস্য গড়ে তোলার মধ্যেও মানুষের সৃজনীশক্তির অভিপ্রকাশ ঘটে থাকে।

সচরাচর ৩০ থেকে ৩৯ বছর বয়স পর্যন্ত সাধারণ মানুষের সৃজনীক্ষমতার বিশেষভাবে স্ফুরণ ঘটে, এইটাই ছিল সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা গেছে। অনেকে মনে করেন, অভিজ্ঞতার সম্পদ নিয়ে মানুষ বৃদ্ধ বয়সেও সৃজনীশক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়ে থাকে।

তবে অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদার বাতাবরণে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সৃজনী ক্ষমতার অধিকারী মনে হলেও ততটা সৃজনশীল তাঁরা নন। বার্ধক্য এগিয়ে আসতে থাকলে প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীলতা হ্রাস পাওয়ার মনোবৈজ্ঞানিক কারণ থাকতে পারে — পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি সম্পর্কিত তথ্যগুলি পর্যালোচনা করলেই তা খানিকটা বোঝা যাবে।

বৃদ্ধ বয়সে সৃজনশীলতার অভিপ্রকাশ দেখা গেলেও তার গুণ-বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই তরুণ বয়সের মত স্বচ্ছ এবং প্রাণবন্ত হয় না — বরং বহুলাংশে একটি বিশেষ ধরনের ছাপ থাকে তার মধ্যে। সেজন্য অনেকেই তাকে সত্যিকারের সৃজনশীলতা বলতে দ্বিধা করেন। কিন্তু সমাজে যাঁরা বয়স্থ, তাঁরাই অধ্যাপক, গবেষক, সম্পাদক প্রভৃতি উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন পদাধিকারী হয়ে থাকেন এবং সেই পদমর্যাদার বলে গবেষণা পরিচালনা করেন, পত্রপত্রিকায় রচনা সম্পাদনা করেন, এবং বহুক্ষেত্রে নিছক মর্যাদাবলে যা লেখেন তাই তাঁরা প্রকাশও করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের পদাধিকারই তাঁদের সৃজনশীলরূপে প্রতীয়মান করে রাখে। এটা মনোসামাজিক সত্য এবং অনস্বীকার্য।

ব্যক্তিত্ব বলতে মানুষের দেহমনের যে সর্বাঙ্গীণ বৈশিষ্ট্য সম্পদ বোঝায়, সেটিরও বয়স অনুপাতে তারতম্য ঘটে, একথা বলাই বাহুল্য। সাধারণভাবে মনোবিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের জীবন নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকতে ভালবাসেন এবং সেই চিন্তাই তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রতিফলিত হয়। বার্ধক্যের ব্যক্তিত্ব হয় সচরাচর আত্মকেন্দ্রিক, ঝঞ্ঝাটবিমুখ, সংযত এবং সংরক্ষণশীল।

বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিশ্লেষণমূলক নিরীক্ষা বেশ কিছু হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, ব্যক্তিত্বের ধারাবাহিকতা জীবনের সকল পর্যায়ে সমভাবে অক্ষুণ্ণই থাকে। কিন্তু কোন ব্যক্তির বৃদ্ধ বয়সের ব্যক্তিত্বের কাঠামো বা ভিত্তিমূল তাঁর বাল্যকাল বা তরুণ বয়সের ব্যক্তিত্বের ছাপ বহন করতেই থাকে। অর্থাৎ বার্ধক্যের পর্যায়ে এলেও মানুষের ব্যক্তিত্বের মূলগত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে এবং তা লক্ষ্য ক'রে বহুদিন পরেও কোনও মানুষকে দেখে পরিচিত জনেরা বলে উঠতে পারেন, 'আরে, তুমি দেখছি ঠিক আগের মতই রয়ে গেছ!'

তৃপ্তিবোধ ঃ বার্ধক্যের আগমনে মানুষের মনে জীবনের তৃপ্তিবোধ সম্পর্কে কিরকম মনোভাব সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে নিরীক্ষা মাধ্যমে জানা গেছে, সুস্বাস্থ্য, সুখী দাম্পত্য জীবন, স্বচ্ছল আর্থিক সঙ্গতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপরেই নির্ভর করে বৃদ্ধ ব্যক্তির জীবনের তৃপ্তিবোধ।

জীবনের নীতিবোধও নির্ভর করে ঐ ধরনের কতকগুলি সামাজিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর। যেমন, স্বামী বা স্ত্রী-বিয়োগ ঘটলে মানুষের নীতিবোধ দুর্বল হয়ে পড়ে, এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে। বিধবা মহিলা এবং বিপত্নীক পুরুষের মধ্যে অনেকেই জীবন সম্পর্কে হতাশা পোষণ করেন, এবং তার ফলে উদ্যোগ উদ্দীপনা হ্রাস পায়, যা থেকে স্বাস্থ্যভঙ্গ, অর্থকষ্ট, প্রভৃতি উপসর্গ জাগে।

কিন্তু যদি বিধবা এবং বিপত্নীক মানুষ বৃদ্ধ বয়সেও বিগত জীবনধারার কোন না কোন কর্মোদ্যোগে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারেন, তাহলে দেখা গেছে, তাঁর নীতিবোধ অটুট থাকে। সংসারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যদি যথাযথ নিরাপত্তা পান, এবং সযত্ন পরিবেশে বাস করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাহলে তাঁদের জীবন তৃপ্তসুন্দর হয়ে ওঠে।

মনোবিকার ঃ বয়স বাড়লে কিছু কিছু মনোবিকার অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যেতে থাকে। প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধ মানুষেরই কোন না কোন মনোবিকার দেখা যায়। তবে জটিল মনোবিকারগ্রস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অনুপাত ৫-৬ শতাংশের বেশি হয় না। সাধারণত ৬৫ বছরের বেশি বয়স্ক বৃদ্ধদের মধ্যেই জটিল মনোবিকারের লক্ষণ দেখা যায় এবং একান্তভাবেই চিকিৎসার প্রয়োজন বোধ হয়। এমন একদিন ছিল, যখন সমাজে বৃদ্ধরা অত্যন্ত অবহেলিত হয়ে থাকতেন, তখন মানসিক হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ৬০ শতাংশই হতেন বৃদ্ধ রোগী। এমনকি চিকিৎসকরাও বৃদ্ধ রোগীদের প্রতি ততটা সযত্ন মনোযোগ দিতে আগ্রহ বোধ করতেন না।

বৃদ্ধ বয়সে মনোবিকারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় আর একটি কারণে — সেটি হল, বার্ধক্যে একাদিক্রমে অনেকগুলি দৈহিক মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সম্মুখীন

হতে হয় মানুষকে। পর পর অনেক রকম পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে গিয়ে যে প্রবল মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়, তা সহ্য করা বৃদ্ধ বয়সে অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না বলে মনোবিকার জাগে।

মনোবিকারের লক্ষণ হল পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের শিথিলতা। এরই ফলে মনোবিকারগ্রস্ত বৃদ্ধ মানুষ পরিবেশের কোনও পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কষ্ট পান। এ সব পরিবর্তন আসে স্বামী বা স্ত্রী-বিয়োগ, অর্থ উপার্জনের অবনতি, স্বাস্থ্যহানি, বিশিষ্ট বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন বিয়োগ বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষতি, সন্তান-সন্ততির বিবাহ, ইত্যাদি নানাপ্রকার ঘটনা থেকে।

এই সব অসহনীয় পরিবর্তন সহ্য করতে না পারলে বৃদ্ধ মানুষের দু'রকম মনোবিকার জাগে—

১। **উদ্বায়ু** (নিউরোসিস ; neurosis), এবং

২। **বাতুলতা** (সায়কোসিস ; psychosis)।

উদ্বায়ু মনোবিকারগ্রস্ত বৃদ্ধদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ক্ষতি খুব বেশি হয় না, তবে সঠিকভাবে চিন্তা করা এবং সুষ্ঠুভাবে বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

বাতুল মনোবিকারে ব্যক্তিত্বের বিশেষ ক্ষতি লক্ষ্য করা যায়। বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে অকারণ ভয়-আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং অযৌক্তিক আচরণের অভিপ্রকাশ ঘটতে থাকে।

উদ্বায়ু মনোবিকারের পর্যায়ে যেসব মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্যণীয়, সেগুলির মধ্যে নিচেরগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

বিষণ্ণতা : বৃদ্ধদের বিষাদ মনোবিকার সকলেরই নজরে আসে। এর ফলে বৃদ্ধরা সমাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখেন। বিষাদগ্রস্ত বৃদ্ধ মানুষ নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ, পাপীতাপী মনে করেন। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্যের বিকৃতি থেকে দেখা দেয় উগ্রতা এবং জিদ। অনেকে অল্পেই কেঁদে ফেলেন। অনেকের ঠিকমত ক্ষুধা, ঘুম হয় না। আত্মহত্যার প্রবণতাও এঁদের মধ্যে থাকে। বর্তমান যুগে সামান্য ওষুধ প্রয়োগে বৃদ্ধ বয়সের এই বিষাদ মনোবিকার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে।

উন্মাদনা : বিষণ্ণতা বা বিষাদ মনোবিকারের ঠিক বিপরীত মানসিকতা হল উন্মাদনা। এর ফলে মানুষ আশাবাদী, আত্মনির্ভরশীল, উল্লসিত এবং আত্মশক্তিসচেতন হয়ে থাকে। এই ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্য যাঁদের থাকে, তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি কথা বলেন, অনেক সময়ে অবশ্য কথার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ধরা পড়ে এবং অত্যন্ত কর্মচঞ্চল বলে তাঁদের মনে হয়। বৃদ্ধ বয়সে এরকম মানসিক বৈশিষ্ট্য যদি মনোবিকারের

পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে আয়ু হ্রাস পেতে থাকে। অবশ্য ওষুধের সাহায্যে এই মনোবিকারের প্রশমন ঘটান যাচ্ছে।

রোগাতঙ্ক ঃ বৃদ্ধ বয়সের আরও একটি মনোবিকার হল রোগাতঙ্ক। কোন সময়ে কোনও রোগের কথা শুনলেই এই ধরনের মনোবিকারগ্রস্ত বৃদ্ধ মানুষ ভাবতে থাকেন, তাঁরও বুঝি ঐ রোগ হয়েছে বা হতে পারে, এবং চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বাতুল মনোবিকারগ্রস্ত বৃদ্ধদের অবস্থা সত্যই করুণার উদ্রেক করে। এঁদের কোনভাবেই চিকিৎসার অধীনে আনা যায় না এবং দেহমনে প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েন। এই ধরনের মনোবিকারের মধ্যে প্রধান হল **চিত্তভ্রংশী বাতুলতা** (সিজোফ্রেনিয়া)—যার ফলে চিন্তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না এবং প্রক্ষোভজনিত অস্থিরতা দেখা যায়। বাস্তব জগতের সঙ্গে চিত্তভ্রংশী বাতুল মনোবিকারগ্রস্ত বৃদ্ধ মানুষের সম্পর্ক ব্যাহত হয়ে পড়ে। অত্যধিক কল্পনাপ্রবণতার ফলে এই ধরনের বৃদ্ধ মানুষ মনগড়া আতঙ্ক, ভয়, বিভীষিকায় অহরহ কষ্ট পান এবং অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

মস্তিষ্কের বিকলতা ঃ বৃদ্ধ বয়সে মস্তিষ্কের মধ্যেও জরাজনিত বিকলতা ঘটে থাকে। তার ফলে বুদ্ধি, স্মৃতি, বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা নষ্ট হতে পারে। এই ধরনের বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে দেখা যায়, অতীতের কথা যথাযথভাবে মনে করতে পারছেন না। এই দুর্বলতা অল্প হলে বাস্তব সমাজে খানিকটা মানিয়ে চলা যায় এবং নিজের মত স্বাধীনভাবে চলাফেরাও করা যায়। কিন্তু বেশি পরিমাণে মস্তিষ্কবৈকল্য ঘটলে বিশেষ চিকিৎসা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং সমাজে আর তখন মেলামেশা করা যায় না।

মস্তিষ্কের বিকলতা যখন দুরারোগ্য পর্যায়ে আসে, তখন চিন্তাশক্তির বিকলতা যেমন ঘটে, তেমনি কথাবার্তার মধ্যেও সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তখন নিজের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার সামান্য কাজগুলিতেও উদাসীনতা জাগে। আপন মনে কথা বলতে দেখা যায়। গভীর রাতে জেগে বসে থাকেন। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অবসাদের তাড়নায় অনেক সময়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার প্রবণতাও জাগে। অনেকক্ষেত্রে অঙ্গের বিকলতাও উপস্থিত হয়। এরকম অবস্থায় বছর পাঁচেকের বেশি আয়ু থাকে না। এই সময়ে কোন চিকিৎসাও কাজে লাগে না, শুধুমাত্র সান্ত্বনা আর পরিচর্যা দিয়ে বৃদ্ধ মানুষটিকে শেষ কদিনের জন্য তৃপ্তি দিতে পারা যায়।

আপাতদৃষ্টিতে বৃদ্ধ মানুষকে তরুণদের তুলনায় নানা বিষয়ে হীনক্ষম মনে হলেও যথাযথ সহানুভূতি এবং পরিচর্যা পেলে বহু বৃদ্ধ মানুষ তৃপ্তি সহকারে সমাজের সকলের সঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলতে পারেন এবং সুখী সমাজ পরিচালনায় তাঁদের দীর্ঘ অবদান যথাসম্ভব স্বীকৃতি ও মর্যাদা পায়।

॥ অধ্যায় ৯ ॥
পরিবেশ

পরিবেশ গড়ে ওঠে দুটি প্রধান উপাদানের ভিত্তিতে — মানুষ আর পৃথিবীর অন্যান্য জৈব ও অজৈব বস্তু। পরিবেশের মাধ্যমে মানুষকে মানুষ নানাভাবে প্রভাবিত করছে এবং সেই পরিবেশেরই নানা বস্তু ও তার রূপ রস শব্দ বর্ণ গন্ধ নিয়ে মানুষের জীবন-ধারাকে রূপায়িত করে চলেছে।

মানুষকে নিয়ে পরিবেশের যে প্রভাব গড়ে ওঠে, তারও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে একাধিক পরস্পর সম্পর্কবিশিষ্ট আরও কতকগুলি উপাদান-লক্ষণ তার মধ্যে সক্রিয় হয়ে রয়েছে। যেমন, একটি উপাদান-লক্ষণ হলো মানুষের ধরন — অর্থাৎ যে পরিবেশে বাস করতে হচ্ছে, সেখানকার মানুষগুলি কেমন ধরনের। তাঁরা হতে পারেন শান্তিপ্রিয়, নয়তো কলহপ্রিয় — হতে পারেন সদা কর্মচঞ্চল, কিংবা অলস বাকপটু। পরিবেশের মানুষগুলি শিক্ষিত হলে তার প্রভাব যেমন হবে, অশিক্ষিত অমার্জিত রুচিসম্পন্ন মানুষে-ঘেরা পরিবেশের প্রভাব হবে একেবারেই অন্যরকম।

এইভাবে জনমানুষ বিচার করে পরিবেশের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গেলে পরিবেশের জনসংখ্যার কথাও উঠতে পারে। নিঃসঙ্গ পরিবেশের চেয়ে লোকালয়বেষ্টিত পরিবেশ নিশ্চয়ই সমাজবদ্ধ মানুষকে বেশি তৃপ্তি দিতে পারে ; আবার অনেকের কাছে জনাকীর্ণ পরিবেশ দুঃসহ মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

জনভিত্তিক পরিবেশ প্রকৃতি বিশ্লেষণের প্রচেষ্টায় আরও একটি উপাদান লক্ষ্যপথে আসতে পারে, তা হল জনসংযোগের প্রকৃতি। যে পরিবেশে মানুষকে বাস করতে হয়, সেখানে মানুষের সঙ্গে সংযোগরক্ষার রীতিনীতি হৃদ্যতাপূর্ণ হলে যে ধরনের শুভ প্রভাব সৃষ্টি হয়, লৌকিকতার পরিমিত ভাব-বিনিময়ের আদব-কায়দা নিশ্চয়ই ততখানি তৃপ্তিদায়ক হতে পারে না।

পরিবেশের প্রচলিত সামাজিক আচরণ-বিধিগুলি ঠিক এইভাবেই সব উপাদানগুলিকে পরস্পর দৃঢ়সংবদ্ধ করে এক ধরনের পরিপূর্ণ বাতাবরণ সৃষ্টি করে দেয়, যার মধ্যে

থেকে মানুষ নিজ নিজ মানসিকতা অনুসারে তৃপ্তি বা অতৃপ্তির আস্বাদন পেতে থাকে।

নানা বস্তুকে নিয়ে পরিবেশের যে প্রভাব গড়ে ওঠে, তারও দুটি দিক আছে। একটি হল বস্তুসামগ্রীর সাজানো গোছানো অর্থাৎ বিন্যাসের প্রভাব। আর একটি হল এসবের মাঝে মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিতার মর্যাদাবোধ।

মানুষ আর বস্তু নিয়ে গড়ে ওঠা এই যে পরিবেশ, এর প্রভাবেই মানুষের আচার আচরণ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য সব কিছু নির্ধারিত হয়ে থাকে। যে কোনও বৃদ্ধ মানুষের জীবনধারায় এই প্রভাবগুলির প্রতিক্রিয়া খুব অল্প নয়।

যৌবনে মানুষ যেভাবে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া মানিয়ে নিয়ে চলে, বার্ধক্যে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের সেই ধরনটি হয় অন্যরকমের। কারণ বার্ধক্যের পর্যায়ে মানুষের ইন্দ্রিয়-চেতনাগুলি এত প্রখর থাকে না।

এইসব ইন্দ্রিয়-চেতনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল দৃষ্টি চেতনা। দেখার মাধ্যমেই মানুষ পরিবেশের পরিচয় পায় এবং সেইমত নিজের কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বই পড়া, খবরের কাগজ পড়া, টি ভি, সিনেমা দেখা এসবের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি চেতনা মানুষের কাছে পরিবেশকে স্পষ্ট করে তোলে। দৃষ্টি চেতনা ক্ষীণতর হতে থাকলে পরিবেশ থেকে বৃদ্ধ মানুষ তাই ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। কোথায় কি ঘটছে, কেমন করে ঘটছে, তা বুঝতে দেরি হয়। এই অক্ষমতা থেকে ভয়, আতঙ্ক, উদ্বেগ সৃষ্টি হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রেই। লোকজন কাছে এলে ঝাপসা দৃষ্টির ফলে অপরিচিত আগন্তুক মনে করে অকারণে বৃদ্ধরা বিচলিত বোধ করেন এই জন্যই। ক্ষীণ দৃষ্টি চেতনার জন্য বৃদ্ধরা স্বাধীনভাবে নিরাপদে চলাফেরা করতেও অস্বস্তি বোধ করেন।

শ্রবণশক্তির অবনতি ঘটার ফলেও বৃদ্ধ ব্যক্তিরা অনেক কথা ভুল বোঝেন, ভুল ব্যাখ্যা করেন। এ থেকে তাঁদের আচরণে এমন কিছু অসামাজিক লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যাতে তাঁদের ওপর অনেকে বিরক্তি পোষণ করতেও পারেন। নানারকম শব্দ ভুল শোনার জন্য পথেঘাটে তাঁদের বিপদ আপদ ঘটতেও পারে। এইসব কারণে ক্ষীণ শ্রবণশক্তিসম্পন্ন বৃদ্ধরা সমাজে মেলামেশা কমিয়ে ফেলতে বাধ্য হন এবং তার ফলে পরিবেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে থাকে। পাড়া প্রতিবেশী ও দেশ বিদেশের সমকালীন তথ্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞতা জাগতে থাকার ফলে বংশানুক্রম ব্যবধান (জেনারেশন গ্যাপ্) সৃষ্টি হতেও থাকে অর্থাৎ বর্তমান বংশধারার মানুষদের আধুনিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান-তথ্য-বিশ্বাসের সঙ্গে বৃদ্ধ মানুষের প্রাচীন বিশ্বাসের সংঘাত ঘটে, যার জন্য প্রবীণরা

কিছুতেই নবীন ভাবধারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন না। নবীনেরাও প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়।

বৃদ্ধ বয়সে স্পর্শচেতনাও হ্রাস পায়, সেজন্য গরম, ঠাণ্ডা বা রুক্ষতা, মসৃণতা যথাযথ-ভাবে বুঝতে অসুবিধা হয়। এর ফলে পরিবেশের নানাপ্রকার তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা থেকে বৃদ্ধ মানুষ বঞ্চিত হতে থাকেন।

ঘ্রাণশক্তিও মানুষকে পরিবেশের বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সহায়তা করে। বাড়ির রান্নার গন্ধ এবং হাসপাতালের ওষুধের গন্ধ দুরকম পরিবেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। বৃদ্ধ বয়সে ঘ্রাণশক্তি কমে গেলে অনেক সময় বিপদ আপদের ইঙ্গিতও বুঝতে পারা যায় না। যেমন, ঘরে আগুন লেগে জিনিসপত্র পুড়তে থাকলে প্রথম দিকে বৃদ্ধ মানুষ কোন গন্ধ না পেতেও পারেন, তাতে বিপদ ও ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়। ঠিক তেমনি খাবারদাবার বা ফুলের গন্ধ প্রভৃতি ভাল জিনিসের ঘ্রাণ-চেতনাও কমে যায় বলে বৃদ্ধ মানুষ জীবনের অনেক তৃপ্তিবোধ থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন। আস্বাদন চেতনার ক্ষীণতার ফলেও বৃদ্ধরা অনেকক্ষেত্রে অতৃপ্তি বোধ করেন।

অবশ্য এইসব ইন্দ্রিয় চেতনার ক্ষীণতার পরিণামে বৃদ্ধ মানুষ অনেক রকম অপ্রীতিকর চেতনা থেকেও অব্যাহতি পেয়ে থাকেন, এই সান্ত্বনার কথাটি অবশ্য মনে করা যেতে পারে।

বৃদ্ধ মানুষের প্রধান পরিবেশ হল বাড়ির পরিবেশ। বাড়িতেই শতকরা ৯৫ জন বৃদ্ধ মানুষের বেশির ভাগ সময় কাটে। এজন্য বৃদ্ধ মানুষের জীবনে বাড়ির পরিবেশই বেশি গুরুত্ব বহন করে থাকেন, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। অতি অল্পসংখ্যক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই বাড়ির পরিবেশ থেকে দূরে কোনও আশ্রমে বা তীর্থে গিয়ে বসবাস করা পছন্দ করেন।

নানাকারণে বৃদ্ধ বয়সে কোন কোন মানুষ আর বাড়ির পরিবেশে সুখী থাকতে পারেন না। বাড়ির অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁদের মতপার্থক্য বাড়তে থাকে এবং তা থেকে মানসিক অশান্তি জাগতে থাকে। একই বাড়িতে বহুদিন বাস করেও তাঁদের জীবনধারা ক্রমে বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ে। অনেক সময় নানা কারণে পুরনো বাড়ি যথাযথভাবে মেরামত করানো না হলে, সেরকম বাড়িতে বাস করে বৃদ্ধ মানুষ আরও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এজন্য বৃদ্ধ মানুষের স্বাস্থ্যের কল্যাণে বাড়ির পরিবেশ প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী কিছু কিছু পরিবর্তন করতে পারলে উপকার হয়। তাতে তাঁর জীবনে বৈচিত্র্য আসবে এবং তিনি সুখী বোধ করবেন। বাড়ির সকলের মনেও গতিষ্ণুতা জাগবে।

পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করতে গেলে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। যেমন, বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টিক্ষীণতা আসে। সেজন্য বাড়িতে আলোর ব্যবস্থা কেমন আছে, সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। আলোর পরিমাণ ও তীব্রতা শতকরা ৬০ ভাগ বাড়াতে হবে। ঘরের দেওয়ালের রঙও উজ্জ্বল করতে হবে। যে রঙটি অল্পবয়সীদের কাছে ঝকঝকে লাল বলে ভাল লাগে, সেই রঙই বৃদ্ধ মানুষের চোখে কালচে ঘন লাল বলে অপছন্দ হতে পারে। ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধদের চোখে যাতে বর্ণ-সচেতনতার তৃপ্তি জাগানো যায়, সেজন্য দেওয়ালের কোন কোন জায়গায় বেশ কতকগুলি উজ্জ্বল রঙের মেলামেশা দেখানো যেতেও পারে। ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল রঙের পরদা, বড় বড় ছবি, বড় ক্যালেণ্ডার, বড় ঘড়ি এসব রাখতে পারলেও বৃদ্ধ মানুষের দুর্বল চোখের তৃপ্তি জাগে।

বৃদ্ধদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়ে সামনাসামনি স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে এবং প্রয়োজন মত ভঙ্গিমা সহকারে কথা বললে তাঁদের ভাববিনিময়ের অস্বস্তি কম হয়। বৃদ্ধরা কম শোনেন মনে করে চিৎকার করে কথা বলার কোনও প্রয়োজন হয় না ; সামনে এসে আস্তে আস্তে কথা বলাই ভাল। শ্রবণশক্তি খুব খারাপ হয়ে থাকলে বৃদ্ধদের শ্রবণ-যন্ত্র ব্যবহার করতেও দেওয়া যায়।

নানাভাবে বৃদ্ধ বয়সে মানসিক ও সামাজিক উদ্দীপনা জাগানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে। একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া, বা ধাঁধা-গল্পের আসরে বৃদ্ধ মানুষকে যোগ দিতে বলা হলে তাঁদের সামাজিক উদ্দীপনা জাগে, মনে আনন্দ হয়। সময়, তারিখ, জায়গার নাম, লোকজনের নাম বৃদ্ধ মানুষের কাছে জানতে চাইলে তাঁরা খুশি হন, অথচ তার মাধ্যমে তাঁদের সচেতনতার অনুশীলনও ঘটে।

বৃদ্ধ মানুষের চলাফেরার নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাড়িতে মেঝে এক সমতলে থাকা উচিত। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে হলে, স্নানঘরে যেতে হলে যেন বৃদ্ধ মানুষকে উঁচু চৌকাঠ বা ধাপ পার হতে না হয়। এগুলোর ফলে বৃদ্ধ মানুষের চলা-ফেরায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ওপরতলা থেকে নিচে নামা-ওঠার প্রয়োজনও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলতে হয়। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে বৃদ্ধদের শোচনীয় দুর্ঘটনা খুবই ঘটে থাকে। যেসব ক্ষেত্রে বৃদ্ধদের সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা কিছুটা করতেই হয়, সেখানে সিঁড়িতে মজবুত রেলিং থাকা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের খুব বড় বাড়িতে বাস করাও উচিত নয়। তাঁদের বড় বাড়ি থাকলেও তার মধ্যে সংলগ্ন দু'তিনখানি ঘর মাত্র ব্যবহারের জন্য রেখে বাকিগুলি বন্ধ করে রাখাই ভাল।

বাড়িতে বৃদ্ধ মানুষের নিরাপত্তার জন্যে আরও কয়েকটি বিষয়ে সকলের মনোযোগী

হওয়া দরকার। বাড়িতে চলাফেরার জায়গাগুলিতে কাপড়চোপড়, মাদুর, পাপোষ বা এমন কিছু এখানে সেখানে ফেলে রাখা অনুচিত, যাতে বৃদ্ধ মানুষের পা লেগে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে পারেন। তাঁর হাতের কাছে একটা কলিং বেল বা যে কোনরকম ঘণ্টা রাখা উচিত, যাতে সকলকে তিনি ডাকতে পারেন কোন অস্বস্তি বা দুর্ঘটনা হলে। ইণ্টারকম টেলিফোন থাকলে তো ভালই।

বাড়িতে বৃদ্ধদের সামাজিক মেলামেশার অবাধ ব্যবস্থা রাখা ভাল। বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন কাছাকাছি থাকলে বৃদ্ধ মানুষ প্রফুল্ল বোধ করেন।

তবে বৃদ্ধ মানুষেরও খানিকটা ব্যক্তিগত একান্ত সময় নির্ধারণ করে রাখা উচিত। সকল সময়ে অপেনজন পরিবৃত হয়ে থাকলে নিজের কথা চিন্তার অবকাশ থাকে না। স্টেজে কোনও অভিনেতাকে সর্বক্ষণ অভিনয় করে যেতে হলে যেমন অস্বস্তি হয়, সর্বদা সামাজিক মেলামেশার মধ্যে থাকলে বৃদ্ধ মানুষও তেমনি অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। একলা নিরালা অবসরে কিছু ভাবা, নিজের মনোমত কিছু কাজ করার অবকাশ বৃদ্ধ বয়সেও মানুষের দরকার হয়।

বাড়ির পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যাতে বৃদ্ধ বয়সে মানুষ উপযুক্ত মানসিক শান্তি লাভ করেন। বাড়ি যেন আরামপ্রদ হয়, গোলমাল না থাকে, যাতে বৃদ্ধ মানুষ সহজে ঘুমের তৃপ্তি লাভ করতে পারেন।

বাড়ির বাইরে যে পরিবেশ বৃদ্ধ মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করতে পারে, তা হল সমাজগোষ্ঠী (কমিউনিটি)। মানুষ যে অঞ্চলে যেভাবে যে ধরনের লোকজনের সঙ্গে বসবাস করেন, তাকেই বলে সমাজগোষ্ঠী। যেমন, বর্তমান যুগে সমাজগোষ্ঠীতে দুষ্কৃতকারীদের নানাপ্রকার অপরাধমূলক আচরণের কিছু প্রতিক্রিয়া অবশ্যই বৃদ্ধদের মনে জাগে, কিন্তু খুব বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ওপর দুষ্কৃতকারীদের দৃষ্টি বিশেষ পড়ে না বলে এ বিষয়ে তাঁদের মনোভাব বিশদভাবে জানা যায় না।

অনেকক্ষেত্রে বৃদ্ধ মানুষের ওপর দুষ্কৃতকারীদের অন্যায় আচরণ ঘটে থাকলেও, তিনি তা কাউকে বলেন না। এর কারণ, তিনি আশঙ্কা করেন, এর ফলে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর অক্ষমতা নিয়ে সকলে আলোচনা করবে এবং সে ধরনের আলোচনা তাঁর আত্মমর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর মনে হবে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতকারীরা বৃদ্ধ ব্যক্তির ওপর কোনও রকম শারীরিক অত্যাচার করে না বলেই সমীক্ষালব্ধ তথ্যাদি থেকে জানা যায় ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষতি হয় বৃদ্ধ ব্যক্তির ধনসম্পদের।

বৃদ্ধ মানুষের টাকাকড়ি ছিনিয়ে নিলে তাঁরা দুর্বলতার জন্য দুষ্কৃতকারীকে সহজে ধাওয়া করতে পারেন না, সেজন্য বৃদ্ধদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। অনেকক্ষেত্রে বার্ধক্যের দুর্বলতা-

গুলি দ্রুত নিরাময়ের ভিত্তিহীন প্রতিশ্রুতি দিয়েও অনেকে বৃদ্ধদের প্রবঞ্চনা করে থাকে।

যানবাহন সমস্যাও পরিবেশের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়, যা বৃদ্ধ ব্যক্তিদের যথেষ্ট প্রভাবিত করে। দূর-দূরান্তরের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হলে যানবাহনের ওপর নির্ভর করতেই হবে। অথচ সাধারণের জন্য যে ধরনের যানবাহনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তা বৃদ্ধদের পক্ষে নিরাপদ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যানবাহন বলতে বাস ব্যবহার করতে হয়। অথচ বাসের উঁচু সিঁড়ির ধাপ, অত্যধিক ভিড় এবং তাড়াহুড়ো, কোলাহল বৃদ্ধ বয়সে একেবারেই সহ্য করা যায় না। তাছাড়া বাসে করে কোথাও যেতে হলে বাড়ি থেকে বাসস্টপ পর্যন্ত এবং গন্তব্যস্থানের বাসস্টপ থেকে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি পর্যন্ত যেতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত যথেষ্ট হাঁটতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে এইভাবে নানারকম শারীরিক পরিশ্রম করে সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করা দুরূহ কাজ বলে মনে হয়। নিজস্ব মোটর গাড়ি তো সকলের থাকে না সব সময়ে।

যানবাহনের এই ধরনের নানাপ্রকার অসুবিধার জন্য অনেকক্ষেত্রেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা চিকিৎসাদির জন্য বাইরে বেরুবার আগে অনেক ইতস্তত করেন। বৃদ্ধদের চিকিৎসার জন্য এই কারণেই বাড়ি বাড়ি দেখাশোনার ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। এর ফলে হাস-পাতালে ডাক্তারখানায় ভিড় অনেক কমবে এবং বৃদ্ধ মানুষ বাড়িতে থেকেই চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি পেলে শান্তিলাভ করবেন। হাসপাতালের শয্যাতে চিকিৎসার যে রকম খরচ হয়, বাড়ি বাড়ি চিকিৎসা ও পরামর্শের মাধ্যমে তাতে কম খরচে বেশি জনসেবা প্রসারিত হতে পারবে বলে মনে হয়। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করানোর নিঃসঙ্গতা-বোধ থেকে অনেক বৃদ্ধ তাতে স্বস্তি পেতে পারবেন। অবশ্য কঠিন ব্যাধির ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রযোজ্য না হতেও পারে।

বিভিন্ন অঞ্চলে নানা প্রকার সঙ্ঘ সমিতি থাকে, কিন্তু বৃদ্ধদের জন্য সঙ্ঘ সমিতি কেউ সংগঠন করতে এগিয়ে আসেন না। অথচ তাঁদের নিঃসঙ্গতা-বোধ থেকে যথাসম্ভব মুক্তি দেওয়ার প্রয়োজনে বৃদ্ধদের সংগঠন খুবই দরকার। বৃদ্ধরা অসংগঠিতভাবেই মেলা-মেশা করে থাকেন। সংগঠিত হতে পারলে সমাজগোষ্ঠীর মাধ্যমে তাঁরা নানাপ্রকার সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার আয়োজন করে নিতে পারেন।

বৃদ্ধদের সংগঠন থাকলে তার মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত জীবনে তাঁদের আংশিক সময়ের কর্মসংস্থান, ঘরসংসারের নানা সমস্যায় পরামর্শ সহায়তা পাওয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার সহযোগিতা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আয়োজন করা যেতে পারে। পেনশন, ইনকাম ট্যাক্স, মিউ-

নিসিপ্যাল ট্যাক্স প্রভৃতি নানা ব্যাপারে বৃদ্ধদের এই ধরনের সংগঠিত সঙ্ঘ পরস্পরকে অনেকভাবে সাহায্য করতে পারে।

তবে একটা সত্য অনস্বীকার্য যে, বৃদ্ধদের মধ্যে বিভিন্ন স্বভাবের লোক থাকেন এবং তাঁদের মধ্যে বৈষম্য থাকবেই। ঐ বৈষম্য থাকার জন্যই বৃদ্ধদের এক জায়গায় সংগঠনবদ্ধ করা খুব সহজ কাজ নয়।

॥ অধ্যায় ১০ ॥
অবসর

বৃদ্ধ বয়সে অবসর গ্রহণের ব্যবস্থা আধুনিক সভ্যতার অন্যতম বিশিষ্ট চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়েছে। আগেকার দিনে কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিদের পক্ষেই বার্ধক্যে অবসর গ্রহণ করা যেত। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সকল মানুষের ক্ষেত্রেই কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের নীতি প্রচলিত হয়েছে শিল্পভিত্তিক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। তার আগে ব্যাধি মহামারীতে বহু লোক বার্ধক্যের আগেই দেহরক্ষা করত। আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানের সভ্যতায়, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ, নানাপ্রকার শ্রমলাঘব-কারী কলাকৌশলের ফলে মানুষ শরীর স্বাস্থ্য আগের চেয়ে অনেক ভাল রাখে এবং সাধারণভাবে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে অর্থনৈতিক অবস্থাও ভাল হয়েছে; অনাহারে অযত্নে রোগভোগে বৃদ্ধরা আজকাল আর প্রাচীনকালের মত কষ্টভোগ করেন না। সকল দেশেই নানা উপায়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে, তার ফলে কর্মহীন লোককেও খাদ্য সরবরাহ করা আজ আর অসম্ভব নয়।

আগেকার দিনে অর্থ উপার্জন বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কায় বৃদ্ধরা কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার চিন্তায় আতঙ্কবোধ করতেন। কারণ কর্মস্থল থেকে বিশেষ কিছু অর্থ সঞ্চয় করে উঠতে পারতেন না। আজকাল কর্মক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্পাদির ফলে বৃদ্ধ বয়সে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণকালেও বেশ কিছু সঞ্চিত অর্থপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

অবসর গ্রহণের পরে বৃদ্ধদের সামাজিক সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধদের তৃপ্তিবোধ কমে যায় এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে এ থেকে হীনমন্যতা জাগে। কোন কোন ক্ষেত্রে ২০ বছর কাজ করার পর স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়া চলে; সেক্ষেত্রে অবসর গ্রহণকারীর মনে কোন হীনমন্যতা জাগে না। কিন্তু ৬৫ বছর বয়সে যখন বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করতেই হয়, তখন অধিকাংশ বৃদ্ধ মানুষের মনেই নিজের কর্মক্ষমতার অবনতি সম্পর্কে নিদারুণ হীনমন্যতা অবশ্যই জেগে থাকে।

অবসর গ্রহণকারী বৃদ্ধ মানুষের বৃদ্ধা স্ত্রী অনেক সময়ে এই অবসর গ্রহণ ব্যাপারটাকে ভালভাবে মেনে নিতে পারেন না। তিনি মনে করেন, এর ফলে অবসরপ্রাপ্ত স্বামী ঘরকন্নার কাজে অনাবশ্যক ভূমিকা গ্রহণ করতে চেষ্টা করবেন এবং তাতে অশান্তি বাড়বে। স্বামীর অবসরপ্রাপ্ত জীবনধারাকে তাঁর স্ত্রী কতখানি মনেপ্রাণে মেনে নিতে পেরেছেন, তার ওপরে অনেকটা নির্ভর করে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ মানুষের বার্ধক্যের অবসর যাপনের সুখশান্তি এবং সার্থক সামঞ্জস্য বিধান।

অবসরের সাথে আসে অবকাশ। বৃদ্ধ বয়সে এই অবকাশের শুভ এবং অশুভ ফল দুটিই ঘটে। অবকাশের মধ্যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পড়াশুনা, শিল্পসংস্কৃতির নানাদিকে যেমন মনোযোগ দিতে পারেন, তেমনি আবার দিবারাত্র নিরবচ্ছিন্ন অবকাশের ক্লান্তিতে পার্কে বা ঘরে বসে বসে কেবলই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে সময় কাটান — তাতে মনে হয় অকর্মণ্য জীবনে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় নীরবে দিন গুনছেন।

অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধদের অবকাশ যাপিত হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে। কিছু বৃদ্ধ মানুষ বাগান করার কাজে অবকাশ ভরিয়ে রাখতে ভালবাসেন। কেউ-বা কেবলই ইজিচেয়ারে বসে বসে ভাবতে ভালবাসেন। বাড়িতে টেলিভিশন থাকলে দেখা যায়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আগ্রহই সেদিকে বেশি এবং প্রায় সর্বক্ষণই টি-ভির সামনে মনোযোগ সহকারে বসে থাকতে চান।

টেলিভিশন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবসরপ্রাপ্ত জীবনের অবকাশ অনেকখানি গভীরভাবে ভরিয়ে রাখতে পারে বলেই সামাজিক সুখশান্তির প্রয়োজনে কোনও বিষয়ে তাঁদের নতুন করে কিছু বোঝাতে শেখাতে হলে টেলিভিশন প্রোগ্রামের সহায়তা নেওয়া খুবই উচিত। কেবলমাত্র নাটক, সিনেমা, খবর ছাড়াও বৃদ্ধ বয়সের মানুষের পক্ষে উপযোগী স্বাস্থ্যের কথা, দুর্ঘটনা রোধের কথা, ট্যাক্সের কথা, বাড়ি ঘর সম্পত্তির কথাও নানা বিচিত্র কৌশলে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

॥ অধ্যায় ১১ ॥
পরিবার ও বন্ধুবান্ধব

মানুষের জীবনে পরিবারভুক্ত বিভিন্ন জনের আচার-আচরণের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রভাব অপরিসীম, তা বলাই বাহুল্য। এরই পরিণামে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, তা উপলব্ধি করতে পারলে সাংসারিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা অনেকাংশে সহজ হতে পারে।

অনেকে মনে করেন, বৃদ্ধ হলে পরিবারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি নানাভাবে শারীরিক এবং মানসিক আকর্ষণ কমে যেতে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দাম্পত্য জীবনের মধ্যভাগে যখন সন্তান পালনের গুরুদায়িত্বের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর জীবনধারার বেশ খানিকটা সময় বাধ্যতামূলকভাবে দিয়ে দিতেই হয়, তখনই তাঁদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব প্রায়ই ঘটতে থাকে। কিন্তু বার্ধক্যের পর্যায়ে যখন মাতাপিতারূপে সন্তান পালনের দায়দায়িত্ব অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন বেশ লঘুভাবে জীবনযাপনের সুযোগ এসে যায় এবং বৃদ্ধ বয়সে এ ধরনের লঘু দায়িত্বের পরিবেশে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

সন্তানরা যখন বড় হয়ে নানাপ্রকার বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন মাতাপিতারূপে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দায়দায়িত্বের লাঘব ঘটলেও অন্যরকম অভাববোধ জাগতে থাকে। বিশেষ করে, বৃদ্ধা মায়ের মনে সন্তানদের এই দূরে চলে যাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় এবং বৃদ্ধাদের পক্ষে পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে এই পরিবর্তন মেনে নেওয়া খুব সহজ হয় না।

অবশ্য সন্তানরা বড় হয়ে বৃদ্ধ মা-বাবাকে ছেড়ে ক্রমে দূরে চলে যেতে থাকলে বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কবোধে তেমন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় বলে দেখা যায় না। বরং বাস্তবক্ষেত্রে বার্ধক্যের পর্যায়ে দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি হতেই দেখা যায়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দাম্পত্য অসন্তোষ থেকে যায় এবং সেটা বৃদ্ধা স্ত্রীর আচরণেই বেশি পরিস্ফুট হয়, তার কারণ সন্তানরা পরিবারগোষ্ঠী থেকে দূরে চলে যাওয়ার

ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, সেই অতৃপ্তি অন্য কিছুতেই নারীমনকে ভরিয়ে তুলতে পারে না যথাযথভাবে।

সন্তানের কাছাকাছি থাকার জন্য বৃদ্ধ পিতামাতার মনে যতই আকুলতা থাকুক না কেন, বাস্তবজীবনে কিন্তু দেখা গেছে, বৃদ্ধ পিতামাতার কাছ থেকে একটু দূরে পৃথকভাবে যদি বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানরা বসবাস করে, তাহলেই বংশানুক্রম ব্যবধানের মনোসামাজিক দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা অনেকটা হ্রাস পায় এবং সাংসারিক প্রফুল্লতা অক্ষুণ্ন থাকে।

দূরে বা কাছে যেখানেই থাকুক, বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদের জন্য মাঝেমধ্যে সাদাসিধে উপহার এবং সাধ্যমত অর্থসাহায্য দিতে পারলে বৃদ্ধ মা-বাবা প্রচুর তৃপ্তি লাভ করে থাকেন। সন্তানরা বড় হয়ে সংসারী হয়ে গেলেও তাদের অসুখবিসুখে ছুটে যেতে পারলে বৃদ্ধ মা-বাবা বড় আনন্দ পান। নাতিনাতনীদের রোগব্যাধিতে তাদের যত্ন সেবা, চিকিৎসা বিধান, এটা সেটা করে দেওয়ার সুযোগ পাবার জন্যে বৃদ্ধ পিতামহ-পিতামহীরা যেন উদগ্রীব হয়ে থাকেন।

আবার শতকরা ৭০ জন বৃদ্ধ পিতামাতা তাঁদের বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদের কাছ থেকে নানাপ্রকারে সাহায্য সহযোগিতা পেয়েও থাকেন এবং পাবেন মনে করে আশাও পোষণ করেন। কেবল আর্থিক সাহায্য নয়, কাজেকর্মে, খবরাখবর সংগ্রহে, চিকিৎসা ব্যবস্থায়, বাড়িঘর সম্পত্তি, পেনশন, ট্যাক্স, কোথাও যাতায়াত ইত্যাদি নানা ব্যাপারে বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানরা যার যা সাধ্য সেইমত বৃদ্ধ পিতামাতাকে সহায়তা করলে বার্ধক্যের দিনগুলিতে বড় তৃপ্তি জাগে। এই ধরনের পারস্পরিক আদানপ্রদানের অভিব্যক্তির মাধ্যমে কেউ কাউকে আর অনাবশ্যক বোঝা বলে মনে করতে দেয় না।

বৃদ্ধ বয়সে পরিবারভুক্ত আপনজনদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে অনেকে পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না। তাঁরা এজন্য পরিবারগোষ্ঠীর বাইরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গলাভে বেশি আগ্রহবোধ করতে থাকেন। পরিবারভুক্ত আপনজন অর্থাৎ নিজেদের বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদের সঙ্গে মেলামেশা সকলক্ষেত্রে বৃদ্ধদের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হতে পারে না। তার কারণ, নবীন বংশানুক্রমের মূল্যবোধ, খেয়ালখেলার রুচি, জীবনধারার ভঙ্গি, আগ্রহ অনুরাগ, মনোভাব এবং নানাপ্রকার বিশ্বাস-ধারণা অনেকাংশে প্রবীণ বংশানুক্রমের সঙ্গে মেলে না বলে এই দুই বংশানুক্রমের মধ্যে সহমর্মিতা স্থাপন খুব সহজ হয় না। অভিজ্ঞতা এবং আগ্রহ-অনুরাগের অবশ্যম্ভাবী বৈষম্যের মধ্যেই এই দুই বংশানুক্রমকে অহরহ সদাসতর্ক পদক্ষেপে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়। শুধুই এক পরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলেই তাঁরা একাত্মবোধ করেন, কিন্তু অন্যান্য বহু ব্যাপারে খুব কমই সাদৃশ্য থাকে তাঁদের মধ্যে।

সুতরাং বার্ধক্যের শেষ দিনগুলিতে পরিবারগোষ্ঠীভুক্ত আপনজনদের মেলামেশা বজায় রাখা যেমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বাঞ্ছনীয়, তেমনিই অপরিহার্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের সুযোগসুবিধাগুলি অব্যাহত রাখা।

বৃদ্ধ বন্ধুবান্ধবদের ভাবধারা, রুচি পছন্দ, জীবনপ্রণালী বহুলাংশে একই রকমের হয়ে থাকে। কারণ তাঁরা একই সমসাময়িক পরিবেশে জীবন যাপন করে এসেছেন এবং বর্তমানেও একই রকম পরিবেশের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন বলে তাঁদের মধ্যে মতভেদ কম হয়, সমানুভূতি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বৃদ্ধ বয়সে মন খুলে কারও কাছে কিছু বলতে পারলে মন বড়ই প্রফুল্ল থাকে। অথচ এইভাবে মন খুলে পরিবারগোষ্ঠীর কাউকে সব সময়ে সব কথা বলা চলে না। এসব ক্ষেত্রে সমবয়সী বন্ধুদের আসরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সবরকম মনের কথা উজাড় করে দিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকেন।

॥ অধ্যায় ১২ ॥

রাজনীতি

সমাজে নানা পরিবর্তন হয়ে চলেছে। গণতান্ত্রিক সমাজে এইসব পরিবর্তন আসে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সুতরাং সমাজবদ্ধ মানুষ রাজনৈতিক শক্তিকে কোনও বিষয়ে যেভাবে যতখানি প্রভাবান্বিত করতে পারে, পরিবর্তনের ধরনধারণ সেই পরিমাণে মনোমত হয়ে রূপায়িত হতে থাকে। যে মানুষ বা সমাজগোষ্ঠীর বিশেষ কিছু রাজনৈতিক সভ্য, শক্তি, সংযুক্তি না থাকে, তার পক্ষে মনোমত সামাজিক পরিবর্তন লাভ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সাধারণত বৃদ্ধ বয়সে নানা কারণে মানুষের চিন্তাধারায় সংরক্ষণশীলতা জাগে। এর ফলে বৃদ্ধরা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার অনেক কিছুতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন কিন্তু বহু বিষয়ে আমূল সংস্কার বা পরিবর্তনে সম্মতি দিতে পারেন না। এই ধরনের চিন্তাধারণার ফলেই বৃদ্ধরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন ধরনের দলকে সমর্থন করেন, যে দল সংরক্ষণশীল এবং প্রধানত প্রবীণদের নেতৃত্ব দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে।

বার্ধক্যে রাজনৈতিক ভাবধারা নিয়ন্ত্রিত হয় আর একটি কারণে, সেটি হল বৃদ্ধদের শিক্ষাদীক্ষা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তরুণরা আজকাল বৃদ্ধদের চেয়ে বেশি শিক্ষিত; উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। উচ্চশিক্ষা মানুষের মনে নানাভাবে নতুন চিন্তাধারা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিতে পারে, যা হয়ত বৃদ্ধদের মানসিকতায় থাকে না উচ্চশিক্ষার স্বল্পতার জন্য।

তবে সকল রাজনৈতিক বিষয়ে বৃদ্ধরা সংরক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দেন না। যে সকল প্রস্তাবে তাঁদেরই বিশেষ চাহিদাগুলি পরিপূরণ হতে পারে, সে সকল বিষয়ে তাঁদের চিন্তাধারায় প্রগতিশীল উদারতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সরকার থেকে সকলকে চাকরি দেওয়া হবে, কর্মসংস্থান করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হবে, এমন ধরনের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ব্যবস্থায় বৃদ্ধরা মনেপ্রাণে সম্মতি দিতে দ্বিধা করেন। কারণ তাঁরা মনে করেন, তাঁরা নিজেরা তরুণ বয়সে যেভাবে স্বনির্ভর প্রচেষ্টায় জীবনে নানাবিধ সংগ্রামের

মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছেন, সেইভাবে বর্তমান যুগের তরুণরা অগ্রসর হলে তবেই তাদের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব, অন্যথায় তারা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে।

রাষ্ট্রীয় বৈদেশিক নীতিসংক্রান্ত বিষয়গুলিতেও বৃদ্ধরা বহুক্ষেত্রে সংরক্ষণশীলতার মনোভাব পোষণ করেন বলে মনে হয়। কেননা, দেখা গেছে, প্রতিবেশী অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য-সহায়তা দেওয়ার ব্যাপারে বৃদ্ধরা নিজের রাষ্ট্রের উদারতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুমোদন করতে পারেন না।

বৃদ্ধ বয়সে ভোটদানের আগ্রহ বেশ বৃদ্ধি পায়। তবে অনেকে বৃদ্ধ হলে ভোটদানে যোগ দিতে পারেন না, বিশেষত বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে ভোটদান অনেক কমে যায়। অনেক বৃদ্ধার জীবনে বৈধব্য এলে ভোটদান বন্ধ করে দেন; কারণ আগে তাঁরা স্বামীর সঙ্গে ভোটদান করতে যেতেন — এখন স্বামী না থাকায় ভোটদানের আগ্রহ বা সুযোগ সুবিধা আর থাকে না। শারীরিক অক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধার জীবনে ভোটদানের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। যেসব বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জীবনে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তাঁদেরও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভোটদানের প্রয়োজনবোধ নষ্ট হয়ে যায় দেখা গেছে।

বৃদ্ধবয়সে ভোটদানের সম্ভাবনা কমে যাওয়ার কারণ অনেক রকমের হতে পারে— যেমন, রাজনৈতিক বিষয়ে বিতৃষ্ণা বিরক্তি, দাম্পত্য সাথীর মৃত্যু ইত্যাদি। এসব কারণে বৃদ্ধ বয়সে অনেকে দেশের রাজনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন না।

অবশ্য বিবিধ গণপ্রচারের মাধ্যমে দেশ ও পৃথিবী সম্পর্কে আধুনিক তথ্যাদি বৃদ্ধদের মনের দুয়ারে পৌছে দিয়ে তাঁদের বয়স্ক জীবনে ধারাবাহিক শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন মেটাতে পারলে দেখা যায়, রাজনৈতিক জীবনে তাঁদের আগ্রহ অনুরাগ অক্ষুণ্ণই রয়েছে। পরিবর্তনশীল জাগতিক পরিবেশ সম্পর্কে সমসাময়িক তথ্য আহরণ এবং শিক্ষা অর্জন বন্ধ হয়ে যায় বলেই বৃদ্ধ বয়সে রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহ কমে যেতে থাকে। শিক্ষাগ্রহণের ধারাবাহিকতা নানাভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকলে বৃদ্ধদের অভিজ্ঞতাপুষ্ট মূল্যবান অভিমতের শুভফল থেকে রাষ্ট্র এবং জনগণ যথেষ্টই লাভবান হতে পারত।

সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভোটদানের আগ্রহ, রাজনৈতিক আগ্রহ কমে গেলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রদূত, রাজ্যপাল, উচ্চতম আদালতের বিচারক, রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে বৃদ্ধরাই সমধিক সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব অর্জন করে থাকেন। লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভা প্রভৃতি সংস্থাগুলিতেও বৃদ্ধদের প্রতিনিধিত্বই বেশি। সুতরাং দেখা যায়, উচ্চতর রাজনৈতিক পর্যায়ে বৃদ্ধদের আগ্রহ উদ্যোগ কমে না। সম্ভবত ঐ সকল ক্ষেত্রে বৃদ্ধদের স্বাভাবিক বয়োজ্যেষ্ঠ মর্যাদা

পরিতৃপ্তি লাভ করে বলেই আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তবে আধুনিক যুগে এসব রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিদের বয়স বিগত যুগের প্রতিনিধিদের চেয়ে কিছু কিছু করে কম হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতেও বৃদ্ধদের প্রতিনিধিত্ব সম্ভবত আরও হ্রাস পাবে আগামী যুগে।

সে যাই হোক্, এখনও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধদের প্রতিনিধিত্বের সুস্পষ্ট প্রাধান্য স্বীকার করতেই হবে কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে লক্ষ্য করেছেন — বৃদ্ধ রাজনীতিজ্ঞরাও বৃদ্ধ জনগণের জন্য বিশেষ কোন কল্যাণমূলক কর্মসূচীর প্রস্তাবনা রাখেন না। এই ব্যাপারে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, বৃদ্ধ রাজনীতিজ্ঞরা নিজেদের বড় একটা বৃদ্ধ বলে মনে করেন না। অর্থ, প্রতিপত্তি, যশ, মর্যাদা, সুস্বাস্থ্য, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি নানা কারণে বৃদ্ধ বয়সে রাজনৈতিক নেতারা বৃদ্ধদের সমপর্যায়ে নিজেদের মনে করতে পারেন না এবং সেজন্য বৃদ্ধদের সমস্যাদিও উপলব্ধি করতে পারেন না। অন্যভাবে বলতে পারা যায় যে, বয়সে তাঁরা বৃদ্ধ হলেও সমাজের গরীব মধ্যবিত্ত বৃদ্ধ জনগণের সমস্যার জগৎ থেকে তাঁরা স্বাভাবিক কারণে বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছেন।

বৃদ্ধ রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের নেতৃত্বের সামর্থ্য সম্পর্কে জনগণের মর্যাদাবোধ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিজেদের বার্ধক্য নিয়ে হাজির হতে চান না। কারণ ভোটদাতারা তাঁদের প্রতিনিধিকে বৃদ্ধ অক্ষম মনে করলে সমর্থন কমে যেতে পারে।

বৃদ্ধ রাজনৈতিক নেতারা একথাও নিশ্চয় ভেবে থাকেন যে, বৃদ্ধ জনগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে ব্যয়বহুল প্রকল্পাদির প্রস্তাব করলে অধিকাংশ ভোটদাতারা যাঁরা বৃদ্ধ নন, তাঁরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে পারেন।

বৃদ্ধরা নিজেরা সঙ্ঘশক্তিতে শক্তিমান হয়ে সংস্থা সংগঠন করতে পারলে অবশ্য রাজনৈতিক নেতাদের মনোভাব পরিবর্তনে অনেকভাবে প্রভাব সৃষ্টি করা যায়। বৃদ্ধদের নানাপ্রকার অভাব-অভিযোগ দাবীদাওয়া নিয়ে বৃদ্ধদের সঙ্ঘবদ্ধ সংগঠন মাধ্যমে যদি আন্দোলন চলে তাহলে রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সচেতন হতে পারেন।

দেশের জনসংখ্যায় বৃদ্ধদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাঁদের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার নানাপ্রকার ব্যবস্থা ও প্রসার ঘটছে, সুতরাং বৃদ্ধদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে অদূর-ভবিষ্যতে বৃদ্ধদের প্রভাব ও ভোটদানের মাধ্যমে রাজনীতির চিন্তাধারা সৃষ্টির সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেতে পারে। অনেক সমাজবিজ্ঞানীর সেই রকমই ধারণা।

এ যুগে যাঁরা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ, তাঁরাই আগামী যুগে যখন বার্ধক্যে উপনীত হবেন, স্বভাবতই এযুগের বৃদ্ধ মানুষদের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশি উদার ও প্রগতিমূলক

মনোভাবাপন্ন হবেন। তার ফলে ভোটদানের ব্যাপারে এযুগের বৃদ্ধদের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় দিতে পারবেন। এরই পরিণামে দেখা যেতে পারে, আগামী যুগের বৃদ্ধরা রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি বেশি আস্থা পোষণ না করে ব্যক্তিগত নেতাদের প্রস্তাব-পরিকল্পনা ইত্যাদির প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করবেন। ফলে, যে সব রাজনৈতিক নেতা আগামী যুগে বৃদ্ধদের বিশেষ অভাব অভিযোগ দাবীদাওয়ার প্রতি সক্রিয় সহানুভূতি পোষণ করবেন, তাঁরাই সে-যুগের বৃদ্ধ ভোটদাতাদের বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হতে পারবেন।

সংক্ষেপে বলা চলে যে, আগামী দিনের বৃদ্ধ ভোটদাতারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ যুগের বৃদ্ধ ভোটদাতাদের মত আর নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকতে পারবেন না। এ যুগের যুযুধান বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন তরুণ সমাজ আগামী যুগের বৃদ্ধ হয়ে নানাপ্রকার তীব্র তীক্ষ্ণ কর্মকৌশলের মাধ্যমেই বাঞ্ছিত কর্মসূচী গ্রহণে রাজনৈতিক নেতাদের প্রবৃত্ত করতে সচেষ্ট হবেন, এরকম ধারণা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে না।

॥ অধ্যায় ১৩ ॥

ধর্মচিন্তা

ধর্ম সব মানুষের জীবনেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর কারণ হল এই যে, মানুষের বিশ্বাস অভিমত এবং মূল্যবোধ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে ধর্মের। এর মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজেকে এবং জগতের অন্য সকলকে দেখতে, যাচাই করতে এবং বুঝতে শেখে।

বৃদ্ধ বয়সে অধিকাংশ মানুষেরই ভগবানে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ভগবান আছেন, এই ধারণা বার্ধক্যেই দৃঢ়তালাভ করে। তবে, ভগবৎচিন্তা জীবনে যতই অপরিহার্য হোক, ঐ চিন্তার মাধ্যমেই যে জীবনের সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায়, একথা অনেকেই স্বীকার করেন না। বৃদ্ধদের অভিমত এই যে, ধর্মচিন্তার চেয়ে আপনজন এবং বন্ধুবান্ধবদের মাধ্যমেই তাঁরা সবকিছুর চেয়ে বেশি তৃপ্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে থাকেন।

বৃদ্ধরা যে ধর্মচিন্তা পোষণ করেন, অনেকক্ষেত্রেই তার মধ্যে কোন পরিবর্তন সৃষ্টি করা খুবই কঠিন কাজ বলে মনে হয়।

ধর্মস্থানে যাওয়ার ব্যাপারে বৃদ্ধদের চেয়ে বৃদ্ধাদের আগ্রহ বেশি দেখা যায়। বৃদ্ধরা বাড়ির বাইরে বিভিন্ন ধর্মস্থানে যাওয়া কমিয়ে দিলেও বাড়ির মধ্যে ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও চর্চা নিয়ে বেশি সময় কাটাতে ভালবাসেন।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মসংস্থার মাধ্যমে বৃদ্ধ মানুষকে নানাভাবে তৃপ্তি দেবার চেষ্টা করা হয়। ঐ সব ধর্মসংস্থার সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত রেখে বৃদ্ধ ব্যক্তিরা সমচিন্তার সঙ্গ-লাভে প্রীতি অর্জন করেন এবং শোকে দুঃখে অনেকাংশে সান্ত্বনা খুঁজে পান।

ধর্মসংস্থাগুলি এই কারণেই বৃদ্ধ মানুষদের বহুরকম সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে সমাজের প্রকৃত কল্যাণকর একটি কাজে ব্রতী হতে পারেন। নিয়মিত ঈশ্বর চিন্তা, ধর্মকথা আলোচনা ছাড়াও বৃদ্ধ বয়সের সবরকম মানসিক, শারীরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে বাস্তব পরামর্শ ও সহযোগিতার নিয়মিত বন্দোবস্তও ঐ সকল ধর্মসংস্থাগুলির মাধ্যমে করা যেতে পারে।

বৃদ্ধ বয়সে অনেকেই ধর্মস্থানে গিয়ে ধর্মসংস্থার তত্ত্বাবধানে কোনও আশ্রমে জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করতে চান। কিন্তু সেই জাতীয় আগ্রহী সমস্ত ইচ্ছুক বৃদ্ধদের গ্রহণ করা বাস্তবিকই সম্ভব নয়। সুতরাং আগের অনুচ্ছেদে যে পরামর্শ দানের ব্যবস্থা উল্লেখ করা হল, তার ব্যাপকতর আয়োজন করাই সমীচীন।

ধর্মসংস্থাগুলি ভগবৎচিন্তা প্রচারের অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করার সাথে বৃদ্ধ মানুষদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে সমাজকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিনিধিত্বের প্রশংসনীয় উদ্যোগ প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়া ভগবৎবিশ্বাসী বৃদ্ধদের জন্য প্রয়োজনমত যানবাহনের ব্যবস্থা করা, চিকিৎসার আয়োজন করা, এই ধরনের নানাবিধ সহায়ক কার্যাবলীর মাধ্যমে ধর্মসংস্থাগুলি বার্ধক্যে বহুজনকে সুখী করতে পারে এবং তার ফলে রাষ্ট্র জনসাধারণের কাছে অধিকতর আস্থাভাজন হবে।

বৃদ্ধ বয়সে ধর্মচিন্তার প্রাধান্য মানুষকে অকর্মণ্য করে তোলে, এমন আশঙ্কা অনেকে করে থাকেন। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস বৃদ্ধ মানুষের নানাপ্রকার সাধারণ সমস্যা থেকে উত্তরণের মানসিক প্রেরণা সৃষ্টির পক্ষেও বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারে। নিঃসঙ্গতাবোধ, শোক দুঃখ এবং অশান্তি থেকে অব্যাহতি পাবার একটি অবিসম্বাদিত পথ হল ধর্মচিন্তা।

তাছাড়া, আসন্ন মৃত্যুর ভয় আতঙ্ক কমানোর ব্যাপারেও বৃদ্ধ মানুষকে সহায়তা করতে পারে ধর্মবোধ। দেখা গেছে, যাঁরা সংরক্ষণশীল ধর্মীয় মনোভাব পোষণ করেন, মৃত্যুর আতঙ্ক তাঁদের মনে কম হয়। যাঁরা ভগবানে বিশ্বাস করেন না, তাঁদেরই মৃত্যুভয় বেশি হয়।

বাস্তবিকই, সর্বকালে সর্বদেশে এই সত্য নানাভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, বৃদ্ধ বয়সে নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ চর্চা করলে জীবনের নানাপ্রকার পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের নিরাসক্ত মানসিকতা গড়ে ওঠে। অবশ্য একথাও সত্য হতে পারে যে, জীবনে যাঁরা বৃদ্ধ বয়সে সামঞ্জস্য বিধানের কাজে সফলতা অর্জন করতে পারেন, তাঁরাই ধর্মগ্রন্থ চর্চায় মনোনিবেশের মানসিকতা গড়ে তুলতে পারেন।

স্বাস্থ্যহানি অথবা আর্থিক পরিস্থিতির ফলে বৃদ্ধ বয়সে মানুষের ওপর যে পরিবেশ দুর্বিষহ বোধ হতে থাকে, তা থেকে বিকল্প জগতের অস্তিত্ব খুঁজে পাবার জন্যই ধর্মচিন্তার দিকে স্বভাবতই আকর্ষণ বাড়তে থাকে। হতাশা বিষাদে পরিপূর্ণ পরিবেশে বৃদ্ধ বয়সে দিন কাটানোর সময় এরকম বিকল্প স্বচ্ছন্দ অস্তিত্ব খুঁজে ফেরা অস্বাভাবিক নয়। ধর্মচিন্তাই পার্থিব জগতের বন্ধন দুর্দশা থেকে মুক্ত হবার এবং ভালোভাবে জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়ে যাবার পথনির্দেশ দিতে পারে। এইভাবে বিশ্লেষণ করলে বেশ বোঝা

যায়, সুখময় বার্ধক্যের জীবনধারা সৃষ্টি করতে হলে যা যা প্রয়োজন, সেগুলির মধ্যে ধর্মচিন্তা নিঃসন্দেহে একটি প্রাথমিক উপাদান।

আরও দেখা গেছে, যাঁদের মানসিকতায় ধর্মীয় ভাবধারা কোনওভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তাঁরা বহু সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে সাহসিকতার মাধ্যমে বাস্তবের সম্মুখীন হতে দ্বিধাগ্রস্ত হন না। এর কারণ, এই ধরনের ধর্মীয় ভাবধারাসম্পন্ন কোনও মানুষ সহজ সাবলীলভাবে সমস্ত সমস্যাকে ধর্মচিন্তার কাঠামোর মধ্যে রেখে বিচার বীক্ষণ করে উপলব্ধি করতে পারেন অন্য যে কোনও লোকের চেয়ে অনেক স্বচ্ছ মন নিয়ে এবং তার ফলে, তাঁদের মধ্যে এসব থেকে প্রক্ষোভজনিত ক্ষতবেদনা সৃষ্টি হয় যৎসামান্যই।

এসব ছাড়াও ধর্মবোধ মানুষকে বৃদ্ধ বয়সে আরও নানাপ্রকারে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়। এইসব ধর্মসহায়ক কাজগুলির মধ্যে থাকতে পারে — ধর্মস্থানের আচার অনুষ্ঠানে ধর্মীয় কর্মীদের সঙ্গে সহায়তা, ধর্মসংস্থার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বিপন্ন, বিকলাঙ্গ, মানুষের কল্যাণে স্কুল ইত্যাদি পরিচালনা করা, ঘরবাড়ি মেরামত করা ইত্যাদি কাজে আত্মনিয়োগ।

ধর্মচর্চা পরোক্ষভাবে বৃদ্ধ বয়সে মানুষকে অর্থবহ সার্থক পরিতৃপ্তি লাভের উদ্দীপনাময় জীবনের নানা সন্ধান নতুন করে জানাতে পারে। কেবলমাত্র ব্যস্তসমস্ত কাজের মাধ্যমে নয়, সঙ্গীত, শিল্পকলা, অবসর বিনোদন, আনন্দদায়ক শিক্ষাসূচীর মাধ্যমেও বৃহত্তর সমাজগোষ্ঠীর সঙ্গে বৃদ্ধ মানুষদের সম্পর্কধারা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা যায়। এ ধরনের কার্যসূচী নিঃসন্দেহে বৃদ্ধদের কাছে পরম প্রীতিপ্রদ, চিত্তাকর্ষক এবং পরিপূর্ণতার আশ্বাস বহন করে আনে।

কিন্তু অনেকে বৃদ্ধ বয়সে ধর্মচিন্তার অসমঞ্জস প্রাধান্যের বিরোধিতা করে বলেন, ধর্ম-চিন্তার ফলে বৃদ্ধ মানুষ আরও বেশি কর্মবিমুখ হয়ে পড়তে থাকে এবং তারই জন্য বার্ধক্যের লক্ষণাদি নাকি দ্রুতগতি লাভ করে। অন্তরে অন্তরে বৃদ্ধ মানুষ এই মানসিকতার ফলে আরও বেশি বৃদ্ধ বলে নিজেকে মনে করতে শেখেন।

প্রকৃতপক্ষে, ধর্মচর্চার সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতেই এই ধরনের বিরোধিতার বিশ্লেষণ করা উচিত। সমকালীন সমাজ-মন যদি ধর্মচর্চার মানসিকতাকে সহ্য করতে না পারে, বুঝতে না পারে, একে বার্ধক্যে কর্মবিমুখতার জন্য দায়ী করে, তাহলে বৃদ্ধ মানুষ এ থেকে তৃপ্তি অর্জনে অক্ষম হবেন এবং তার ফলে তাঁদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতিকূলতাই সৃষ্টি হতে পারে।

॥ অধ্যায় ১৪ ॥
উপসংহার

বার্ধক্য সম্পর্কে সমাজ-মনের বিশ্লেষণ প্রচেষ্টায় পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে যা বিধৃত হয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য হল—সমাজ-মনোবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধ মানুষের প্রতি সমাজের সকলের দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কার সাধন। এই বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা কেবলমাত্র বৃদ্ধদের উদ্দেশেই পরিবেশিত হল না — বৃদ্ধ সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেরই চিন্তাভাবনা জাগরূক করার জন্যই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপস্থাপনা।

বৃদ্ধ মানুষদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হলে যে সব মূলগত মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলি জানা দরকার এবং সেগুলির শারীরবৃত্তিক, সামাজিক প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিবেচনাগুলিও দৃষ্টিপথে রাখা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাধ্যমে প্রাথমিক সচেতনতা সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখেই আগের অধ্যায়গুলি বিন্যস্ত হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়বস্তু নিয়ে আরও অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা হতে পারে এবং নিশ্চয়ই হবে।

সমাজ-মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৃদ্ধ-সমাজ তথা বৃহত্তর সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার কল্যাণকল্পে এই সূত্র অনুসরণ করে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসতে পারে সমাজ-কল্যাণ সংস্থাগুলি। শিশু-কল্যাণ, নারী-কল্যাণ, শ্রমিক-কল্যাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজ-কল্যাণ সংস্থাগুলির সেবা-প্রচেষ্টার একটি ভগ্নাংশও যদি অবহেলিত বিষাদগ্রস্ত হতাশাচ্ছন্ন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহলে সমাজ অবশ্যই তাঁদের আশীর্বাদে ধন্য হবে— যাঁদের কথা বড়-একটা কেউ ভাবে না।

শুধু মৌখিক সহানুভূতি জানালেই বৃদ্ধদের প্রতি সমাজের কর্তব্য শেষ হবে না— জীবনের শেষ কটা দিন তাঁদের জীবন প্রফুল্লতায় ভরিয়ে রাখার উপযোগী কর্মসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব নিতে হবে সমাজের সকলকে।

এ-দায়িত্ব পুত্র-কন্যার, পুত্রবধূ-জামাতার, আত্মীয়-স্বজনের, পাড়া-প্রতিবেশীর সকলেরই সমান। এদের মধ্যে কোনও কারণে একজন যদি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন দায়িত্ব পালনে অক্ষম এবং ব্যর্থ হয়, তাহলে অন্যেরা যেন মুখ ফিরিয়ে না থাকেন — সমগ্র সমাজের সুখ-শান্তি-কল্যাণের স্বার্থে।

মনে হয়, উদার-হৃদয় প্রগতিমনা তরুণ যুব সমাজও এই চেতনা-উন্মেষের সমাজ-কল্যাণব্রতে অনেকখানি স্বেচ্ছাসেবা সমর্পণ করতে পারে। তারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার উদ্যোগে সচেষ্ট হলে সমাজে আদর্শ সৃষ্টি করে ধন্য হবে, আর তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ ক'রে ভাবী সমাজও হবে লাভবান।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিসাবে জানা গেছে, এই শতাব্দীর শেষে পৃথিবীতে লোক সংখ্যা হবে ৬১১ কোটি, তার মধ্যে ৬০ বছর বয়সের বেশি বৃদ্ধের সংখ্যা হবে ৬০ কোটি। আমাদের মতো দেশেই প্রতি চারজনের মধ্যে একজন হবেন ষাটোত্তীর্ণ বৃদ্ধ। ফলে, উপার্জনকারী তরুণ সমাজের ওপর উপার্জনহীন বৃদ্ধ মানুষের চাপ ক্রমশই বাড়ছে। সহানুভূতির মন নিয়েই তরুণ সমাজের প্রত্যেককে এ দায়িত্ব প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম বলেই মেনে নিতে হবে। বিজ্ঞানীরাও খুব চেষ্টা করে চলেছেন, জরা প্রতিরোধক হরমোন (DHEA অর্থাৎ ডিহাইড্রোইপিয়ানড্রস্টেরোন)-এর সংখ্যা দেহমধ্যে বৃদ্ধি ক'রে মানুষের আয়ু বাড়িয়ে দেবেন।

পরনির্ভরশীল ক্রমবর্ধমান সেই বৃদ্ধ সমাজকে আনন্দের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব পড়বে তরুণ সমাজেরই ওপর। যারা আজ কিশোর-কিশোরী, তাদের মন সেইভাবেই গড়ে দিতে হবে এখন থেকে। তরুণ সমাজের উদ্যোগে পল্লীতে পল্লীতে কতই উৎসব অনুষ্ঠান সভাসমিতির আয়োজন হয়ে থাকে। সেই উপলক্ষ্যে অতিথি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতি ইত্যাদি সম্মানিত পদে আমন্ত্রিত হন কত গুণী জ্ঞানী, মন্ত্রী মহারাজ। পাড়ার সেইসব অনুষ্ঠানে পাড়ারই বয়োবৃদ্ধরা যদি ঐ সম্মান-মর্যাদাগুলি পান, তাহলে তাঁরা অনেক খুশি হন — অনুষ্ঠানেরও মর্যাদা তাতে বাড়ে বৈ কমে না।

সব পাড়া-পল্লীতেই বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে একাধিক বিশিষ্ট নারী-পুরুষ অবশ্যই থাকেন; তাঁদের কথা ভুলে গিয়ে নিছক প্রচারের মোহে স্বনামধন্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে আনলে বৃদ্ধরা মনে সত্যিই বেদনা বোধ করেন — একথা তরুণ সমাজ বোঝে না, এটা বিশ্বাস হয় না।

ঠিক সময়ে মনে করিয়ে দিলে তারা নিশ্চয়ই তাদের নবজীবনের উদ্যম-প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রাচীন-পথিকৃৎ মানুষগুলিকেও সামিল করে নেবে। পাড়া-পল্লীর সমাজ-ব্যবস্থা তাতে হবে সুসংবদ্ধ, প্রীতিপূর্ণ, এবং মনোরম। সমাজ-সংহতির পথেও সেই উদ্যোগ হবে এক সফল পদক্ষেপ। কিশোর সমাজও এখন থেকে বৃদ্ধ মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন হতে শিখবে।

গতিষ্ণু সমাজ-মনের স্রোতে সমন্বয়-সামঞ্জস্য বিধানের মন নিয়ে বৃদ্ধ সমাজেরও প্রত্যেককে প্রৌঢ় জীবন থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। বার্ধক্যে উপনীত হলে

সমাজ-মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে সহজভাবেই তাঁরা যেন গ্রহণ করতে পারেন। অক্ষম শিশু যেমন পিতামাতার হাতেই নিজেকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকে, তেমনি বয়োবৃদ্ধ অক্ষম মানুষমাত্রেরই বোধহয় পরমপিতার আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন যাপনে তৈরি থাকা সবচেয়ে ভাল।

বৃদ্ধ বয়সে কতকগুলি অমূলক ভয় আতঙ্ক আর উদ্বেগ দুশ্চিন্তাই হল যত দুঃখের কারণ। শিশুর মতোই পরমপিতার কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকলে বৃদ্ধ বয়সে বেশ নির্লিপ্ত শান্তি অবশ্যই উপলব্ধি করা যায়। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বৃদ্ধ ১২০ বছর বয়সে এক জাপানী বলেছেন, উদ্বেগহীন জীবনই দীর্ঘায়ু ও শান্তির সহায়ক। সবকিছু নিষ্পত্তির দায়িত্ব ভগবানের ওপর ছেড়ে দিতে পারলেই সেটা অনায়াসে সম্ভব।

সৃষ্টি রহস্যে জরা ব্যাধি বার্ধক্য অবশ্যম্ভাবী। সেই চিরন্তন সত্যকে গ্রহণ করবার সাহসিকতা চর্চার প্রকৃষ্ট সময় হল প্রৌঢ়ত্ব। প্রৌঢ়কালে যিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পারেন যে, ইহজীবনে তাঁর কর্মকাল প্রায় সম্পূর্ণ, তিনি তখন বার্ধক্যের সমস্ত আলোড়নকে মনে করেন — বাড়ি ফিরে যাবার জন্য শেষ পর্যায়ে যেন রেলস্টেশনের কোলাহলের মাঝে খানিক প্রতীক্ষা মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

১। **সমুদ্র পরিচয়**/প্রসাদ সেনগুপ্ত/৮·০০
২। **পেশাগত ব্যাধি**/শ্রীকুমার রায়/৭.০০
৩। **আমাদের দৃষ্টিতে গণিত**/প্রদীপকুমার মজুমদার/৭·০০
৪। **শক্তি ঃ বিভিন্ন উৎস**/অমিতাভ রায়/৭·০০
৫। **মানুষের মন**/অরুণকুমার রায়চৌধুরী/৪·০০
৬। **বয়ঃসন্ধি**/বাসুদেব দত্ত চৌধুরী/৯·০০
৭। **ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি**/সংকর্ষণ রায়/৮·০০
৮। **রোগ ও তার প্রতিষেধ**/সুখময় ভট্টাচার্য/৬·০০
৯। **পশুপাখীর আচার ব্যবহার**/জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়/৮·০০
১০। **ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার**/ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ/৬·০০
১১। **গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি**/দুর্গা বসু/১০·০০
১২। **একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ**/কানাইলাল মুখোপাধ্যায়/১০·০০
১৩। **পরিবর্তী প্রবাহ**/ডঃসমীরকুমার ঘোষ/৭·০০
১৪। **বাস্তব সংখ্যা ও সংহতিতত্ত্ব**/প্রদীপকুমার মজুমদার/১০·০০
১৫। **অতিশৈত্যের কথা**/দিলীপকুমার চক্রবর্তী/৭·০০
১৬। **এফিড বা জাবপোকা**/মনোজরঞ্জন ঘোষ/১২·০০
১৭। **সয়াবীন**/দ্বিজেন গুহবক্সী/৯·০০
১৮। **জৈবসার ও কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান**/শ্যামল বণিক/১২·০০
১৯। **পাতালের ঐশ্বর্য**/সংকর্ষণ রায়/১০·০০
২০। **নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র**/সুশীল ঘোষ/১২·০০
২১। **ঘরে করো শিল্প গড়ো**/তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়/১১·০০
২২। **আমাদের জীবনে পাখী**/সুধীন সেনগুপ্ত/১৪·০০
২৩। **জিওল মাছ**/শচীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়/১২·০০
২৪। **ক্যাকটাস ও ফুলচাষ** বলাইলাল জানা
২৫। **আবহাওয়া ও আমরা**/অপরাজিত বসু/১০·০০

ছয় টাকা